

স্ফুলিঙ্গ

প্রবোধকুমার সান্যাল



এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। কলিকাতা বারো

প্রকাশক : শ্রীনির্মলেন্দু ভদ্র
এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, এ-৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী
প্রচ্ছদ-ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকসন্ সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৬
তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

মুদ্রাকর : শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান
নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৭, ভীম ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

স্ফু লি ঙ্গ

লেখকের অন্যান্য বই

হাসুবানু বনহংসী কল্লান্ত তুচ্ছ জলকল্লোল শ্যামলীর স্বপ্ন
স্বাগতম সায়াহ্ন দুর্গমের ডাক কাদামাটির দুর্গ আঁকাবাঁকা
মহাপ্রস্থানের পথে দেশ-দেশান্তর উত্তরকাল আগ্নেয়গিরি
নদ ও নদী দেবতাত্মা হিমালয় স্বনির্বাচিত গল্প শ্রেষ্ঠ গল্প
অঙ্গার ঝড়ের সঙ্কেত পুষ্পধনু মধুচাঁদের মাস অরণ্য পথ
বন্দী বিহঙ্গ প্রিয় বান্ধবী বীরবলের রঙ্গরঙ্গ ইত্যাদি

স্ফুলিঙ্গ

১

কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাত নামিয়া আসিতেছিল শহরের উপর দিয়া। আলো জ্বলিতেছে তখনও পথে পথে। এক-আধটা মোরগ ডাকিতেছিল।

কোনো কোনো চিমনির পাশে আগুন জ্বলিতেছে। সেই আলোর আভায় বস্তির পথে একটু আধটু উজ্জ্বল দেখা যায়। এক-আধজন ছায়াচারী এখান হইতে ওখানে পার হয়। কেউ বা জলের কলের তলায় আগে-ভাগে তাড়াতাড়ি বালতি রাখিয়া চলিয়া যায়। বস্তির গোলকধাঁধাঁর মধ্যে ভারী ভারী পায়ের শব্দ করিয়া কয়েকজন পুলিশের লোক সন্তর্পণে আগাইয়া আসে। দাওয়ার ধারে শুইয়াছিল এক বুড়ি, জরাজীর্ণ,—উৎকর্ণ হইয়া সে একবার তাকাইল, তারপর পুনরায় কাঁথা মুড়ি দিল।

পুলিশ আসিয়া তাহাকে পর্যবেক্ষণ করে, টর্চ টিপিয়া নোটবই দেখিয়া একবার নিশ্চিন্ত হইয়া লয়। সামনে দরজা বন্ধ। বুড়িকে একজন আগলাইয়া দাঁড়াইয়া, তারপর চারিদিক হইতে চালাঘরখানাকে তাহারা ঘেরাও করিবার চেষ্টা করে। বুড়ি নিঃসাড়ে পড়িয়া থাকে, কিন্তু কাঁথার নিচে দিয়া সে তাহার একখানা পা নাড়ে। তাহার এক পায়ে দড়ি বাঁধা, সেই দড়ির অন্য ভাগটা চৌকাঠের ফাঁক দিয়া ভিতরে গিয়া একটি ময়লা বিছানায় টান পড়ে—সেখানে শুইয়াছিল একটি যুবক,—দড়ির শেষাগ্র তাহার পায়ে বাঁধা।

দড়িতে বার কয়েক টান পড়িতেই যুবকটি সতর্ক হইয়া উঠিয়া পড়ে এবং পলকের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া সে পিছনের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়ে। দড়ির ফাঁস সে খুলিয়া চলিয়া যায়। ওদিক হইতে কাঁথার তলা দিয়া বুড়ি সেটিকে ধীরে ধীরে টানিয়া লয়। পাহারাওলা কিছুই টের পায় না।

কিছুক্ষণ পরে অন্যান্য পুলিশের লোক আটঘাট বাঁধিয়া আসিয়া বুড়িকে জাগায় এবং তাহার নিকট হইতে চাবি চাহিয়া লইয়া ঘর খোলে। ভিতরের বিছানা শূন্য। পিছনের দরজায় শিকল তোলা। শিকার পলাইয়াছে।

বুড়িকে নানারকম জেরা করিয়া পুলিশ নিরাশ হইয়া বিদায় লয়।

২

সকাল হইয়া আসে।

পাশের ঘরের চালায় একটি মেয়ের ঘুম ভাঙ্গে। আড়ামোড়া খাইয়া সে তক্তা হইতে পা বাড়াইয়া নামিবার উপক্রম করিতেই তাহার পা ঠেকিয়া যায় যেন কাহার গায়ে। মেয়েটি চমকাইয়া উঠিয়া দেখে তাহার ঘরের দরজা খোলা কিন্তু সে চেঁচামেচি করিয়া উঠিবার পূর্বেই যুবকটি তক্তার তলা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলে, স্ স্ স্···চুপ···।

—ধরিয়ে দেব···ঠিক ধরিয়ে দেব···আজ তোমাকে কিছুতেই ছাড়বো না ···কেমন ক'রে আমার দরজা খুলেছ?

যুবক একখানি ধারালো খুন্তি দেখাইয়া বলিল, কতক্ষণ লাগে তোর খিল খুল্‌তে?

খুন্তি দেখিয়া মেয়েটি একটু ভয় পায়। তুমি চোর ··· ডাকাত ··· ভয় পাইনে তোমাকে। কই, কেন দাওনি আমার সেদিনের টাকাটা? ওই জন্য কেউ তোমাকে বিশ্বাস করে না!

যুবক তখনও উদ্বিগ্ন হইয়া একবার বাহিরের দিকে তাকায়। তারপর মেয়েটির দিকে চাহিয়া হাসে। বলিল, রাত্তির থাকলে তোর অভিমান ভাঙ্গাতুম ··· কিন্তু এখন সকাল—

—এই নিয়ে কতবার ফাঁকি দিয়েছ ··· আমি শুনবো না, কিছুতেই না ··· আমার টাকা আমাকে দিয়ে যেতে হবে।

ছেলেটি হাসিয়া বলিল, রোজগার কিছু হয়নি বুঝি?

হাসির আস্কারা পাইয়া মেয়েটি আসিয়া ওর পকেট হাতড়াইয়া এক সময়

একটি টাকা পায়। ছেলেটি বলিল, হ্যাঁ একটা টাকা তোর পাওনা ছিল মনে আছে,—

—ব্যাস্—এ আমার! আমি নেবোই···চোর কোথাকার!

ছেলেটি বলিল, কিন্তু মনে রাখিস, ওই টাকাটা ছাড়া আমার আর কিছু নেই দুনিয়ায়। স্রেফ উপোস করতে হবে!

—উপোস করো কি মরো আমি জানিনে! কিন্তু শিগ্‌গির বেরোও ঘর থেকে, নইলে এবার চেঁচাবো!—মেয়েটি এইবার কঠিন হইয়া উঠে।

ছেলেটি হাসিল, তারপর খুন্তিখানি ঘরের কোণে ছুঁড়িয়া দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মেয়েটি কঠিন চোখে পিছন চাহিয়া বলিল, খুনে হারামী কোথাকার!

পথের এক বাঁকে গিয়া ছেলেটি অদৃশ্য হইয়া যায়।—

৩

পুলিশ তাহাকে খুঁজিতেছে, একথা সে জানে। সে মনে করিয়াছিল, আজ সে ছুটি লইবে, ছুটি লইলে তাহার চলিবে না। মেয়েমানুষের সঙ্গে কাজ-কারবার আর নয়। আজ সে ধরা পড়িয়া গিয়াছিল আর কি! কিন্তু ওই পতিতা মেয়েটি অত্যন্ত চতুরা বলিয়াই তাহাকে প্রতারণা করা সহজ ছিল। জনবহুল রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে সে এক জায়গায় থমকিয়া দাঁড়ায়। পথের ধারে একজন জ্যোতিষী হস্তরেখা বিচার করিয়া ভাগ্যের ও ভবিষ্যতের কথা বলিয়া দিতেছে এবং তাহার কাছাকাছি একটি দামী মোটর গাড়ি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সামনে হাসপাতালের প্রবেশপথ। গাড়ি হইতে নামিল স্বামী-স্ত্রী, এবং ড্রাইভার ছাড়া গাড়ির মধ্যে থাকিয়া গেল একটি লোক। তাহাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শোনার জন্য ছেলেটি হঠাৎ দাঁড়ায় জ্যোতিষীর কাছে। জ্যোতিষী তাহার হাত দেখিয়া অদূর ভবিষ্যতে তাহার সৌভাগ্য-লাভের কথা যখন জানায়, তখন সে স্বামী-স্ত্রীর আলাপের মধ্য দিয়া বুঝিতে পারে, একজন আত্মীয় রোগী আছে হাসপাতালে, আজ তাহার অস্ত্রোপচার,—তাহারা

ভিতরে তাহাকে দেখিতে যাইতেছে। ইহাও সে বুঝিতে পারিল, টাকাকড়ি ইত্যাদি সবই গাড়ির ভিতরে ওই লোকটির নিকটে রহিল,—উহারা কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরিবে।

স্বামী-স্ত্রী খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া হাসপাতালে ঢোকে। তাহাদের হাবভাব দেখিয়া মনে হয় রোগী হয়তো বাঁচিবে না!

জ্যোতিষীর নিকট হইতে হাতখানি ছাড়াইয়া ছেলেটি হাসপাতালের ভিতরে ঢোকে, এবং কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া গাড়ির নিকটে গিয়া ভিতরে মুখ বাড়াইয়া বলে, বাবু পাঠিয়ে দিলেন—আপনার কাছে যা টাকা আছে দিন্!

লোকটি বলিল, কেন, টাকা কি হবে?

—বোধহয় ওষুধ কিনতে হবে!

—ওষুধ তো হাসপাতালে দেওয়া হয়!

ছেলেটি বলিল, অত কথা জানিনে। আমি এখানকার চাকর। তবে রোগীর অবস্থা ভালো নয়··· তাড়াতাড়ি বাইরে থেকে ওষুধ এনে দিতে হবে!

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। লোকটি প্রশ্ন করিল, কতটাকা?

ছেলেটি বলিল, কেমন ক'রে জানবো? আজকাল ওষুধের দাম অনেক। শিগ্‌গির দিন্, উনি দাঁড়িয়ে আছেন সেই তেতলায়।—লোকটি বেশ মোটা টাকা বাহির করিয়া দেয়। টাকা লইয়া ছেলেটি চলিয়া যায় বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ আশেপাশে ঘোরাঘুরি করিয়া আসিয়া জ্যোতিষীকে কিছু বক্‌শিস দিয়া আবার গা ঢাকা দেয়।

৪

হোটেলের সামনে গিয়া এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সে তাহার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল—কি রে নন্দলাল,—বাজার কি রকম? এত ঠাণ্ডায় গায়ে চাদর নেই যে!

নন্দলাল একগাল হাসিয়া বলিল, পয়সার গরম!

—আজকাল রোজগার হচ্ছে কেমন রে ?

—আরে ভাই সেদিন আর নেই। আজকাল খেলতে বসলেই আশেপাশে পুলিশ···আইন-কানুন বড় কড়া······।

দুইজনে হোটেলে ঢুকিল।

হোটেল হইতে বাহির হইয়া দুইবন্ধু একদিকে চলিতে থাকে।

নন্দলাল প্রশ্ন করিল, তুই আজকাল কী করিস, শ্যামাপদ ?

শ্যামাপদ বলিল, সে অনেক ঝামেলা ভাই। গেরস্থ ঘরের রান্নার চাকরি, একটুও সময় পাইনে। বাজার করো, ফাই ফরমাস খাটো, ছেলেমেয়েকে বেড়িয়ে আনো, আপিসে টিফিন পৌছে দাও···সে অনেক জ্বালা! আড্ডায় গিয়ে একটু খেলবো···সময় নেই।

—নেশা করিস ?

—করবো কেমন ক'রে ? বাবুরা হজমী-ওষুধ কিনে সব সাবাড় করলে! লোক পাঠিয়ে বেনামে সব কিনে নিয়ে যায় চড়া দামে···আমরা কাছে ঘেঁসতে পাইনে। দুঃখ জানাব এমন মানুষও নেই। চলি রে ভাই—

শ্যামাপদ চলিয়া গেল। নন্দলাল গিয়া একটি পোশাকের দোকানে ঢুকিল। কিছুক্ষণ পরে সে যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন সহসা তাহাকে চেনা যায় না। পরিপাটি পোশাকে সে আচ্ছাদিত। কিছুদূর গিয়া ফুটপাথের এক দোকানের শো-কেসের সামনে সে দাঁড়াইল। জিনিসপত্র সে দেখেনা, দৃষ্টি তাহার নিজের নরম ছায়াটার উপর। প্রতিদিন তাহার পিছনে পুলিশ ছুটিতেছে। অসংখ্য অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে।

কিন্তু জীবনটা যেন বড়ই ক্লান্তিকর। নিত্য ভয়, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা! ইহা হইতে সে মুক্তি চায়—চায় স্বচ্ছল সহজ-জীবন!

হাঠাৎ সে সরিয়া যায়। কোথাও যেখানে হোক—হাঁটিতে থাকে। কিছুদূর গিয়া দেখিল এক ধনী ব্যক্তির অভ্যর্থনা চলিতেছে। অনুরক্তেরা চারিদিকে দাঁড়াইয়াছে, সকলেই বিনীত। ধনীর অভ্যর্থনা জানাইতে পারিয়া তাহারা মহা কৃতার্থ। ভিড়ের ভিতরে আসিয়া নন্দলাল ঢুকিয়া পড়িল। সে

হয়তো কাহারও পকেট কাটিতে পারিত, হয়তো কাজটা সহজও ছিল,—কিন্তু সে সেই ধনী ব্যক্তিটির কাছাকাছি হইবার চেষ্টা করে।

বাধা দেয় সবাই।—আরে, যাও, যাও—এখানে কি? কি চাও?

নন্দলাল কথা শোনে না, বাধা মানে না। সামনে গিয়া নমস্কার জানাইয়া বলিল, আমি বড়ই অভাবগ্রস্ত।

ধনী ব্যক্তি তাকাইলেন।

নন্দলাল নিজ কণ্ঠস্বরে সমস্ত আন্তরিকতা আনিয়া বলিল, গাঁ থেকে এসেছি, খেতে পাইনে, কাজ জোটেনা—দয়া করুন, কিছু দান করুন—

দুইজন দেহরক্ষী আসিয়া নন্দলালকে সরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইল। নন্দলাল বেপরোয়া হইয়া অভিনয় করে, আমার স্ত্রী, সন্তান, মা, বোন—সবাই পথ চেয়ে আছে···দয়া করুন যৎসামান্য, যা পারেন,—অপনি দয়ালু, আপনি মহান্—বলিতে বলিতে নন্দলাল কাঁদিয়া ফেলিল।

কিন্তু ফল কিছু হইল না। সবাই মিলিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় অন্যদিকে। ধনী ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া সকলে মস্ত অট্টালিকায় ঢুকিয়া গেল।

নন্দলাল আড়ালে গিয়া হাসিয়া ফেলে। অভিনয়টা আরো নিখুঁত করিবার দরকার ছিল। তবু সে হাসিল। তারপর শিস্ দিতে দিতে অন্যদিকে চলিয়া গেল।

৫

ইতুসংক্রান্তির মেলা বসিয়াছে শেঠের বাগানের এক মাঠে। সেখানে নন্দলাল গিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, একদিকে ম্যাজিকের আসর জমিয়া উঠিয়াছে। তাসের খেলা, চাকার খেলা, ইত্যাদি চলিতেছে। সেটি জুয়া। জুয়া দেখিয়া নন্দলাল খুব উৎসাহিত। সে গিয়া বাজি ধরিল এবং বাজির পর বাজি হারিতে থাকিল। কিন্তু এটা তাহার কৌশল। খেলোয়াড়ের সঙ্গে সে অবশেষে বাজি ধরে এবং তারপর হইতে খেলোয়াড় হারিতে থাকে। একে একে অনেক টাকা নন্দলাল জিতিল। অবশেষে ঝগড়া বাধিল

খেলোয়াড়ের সঙ্গে। নন্দলাল তাহার সর্বস্ব জিতিয়া লইল। মুখে বলিল, খবরদার, বেইমানি ক'রো না—

কিন্তু দুই-একজন লোকের সঙ্গে কানাকানি করিয়া একসময় খেলোয়াড়টি তাহার আক্রোশের দরুন পুলিশকে ইশারায় ডাকিল। কিন্তু তাহার আগেই নন্দলাল পুলিশের গন্ধ টের পাইল। জিনিসপত্র ফেলিয়া, টাকাকড়ি সমস্ত লইয়া পলকের মধ্যে সে গা ঢাকা দিল।

৬

সহসা পিছন হইতে তাহার পিঠে হাত পড়িল। ফিরিয়া দেখিল শ্যামাপদ। সহাস্যে শ্যামাপদ বলিল, সাবাস—বাহাদুর তুই, মোটা টাকা পেয়ে গেছিস। এবার কি, বিয়ে ক'রে ফেল! তুই তো লেখাপড়া জানিস, ভালো মেয়ে পাবি!

—আমাকে কে মেয়ে দেবে? চাল নেই চুলো নেই—!—নন্দলাল হাসে।

—দেশে তোর কে যেন ছিল রে?

—কেউ না, সেই এক বুড়ি,—মানুষ করেছিল আমাকে। মানুষ হবার আগেই পালালুম! মা-বাপ আগেই অক্কা!

শ্যামাপদ বলিল, ওই শালা জুয়াড়ী আজ আমাকে পথে বসালে।

—কেন?

—কানের মাকড়ি বেঁচে মেলায় এলুম,—শালা হাতের কায়দায় সব মেরে দিলে ভাই!

—মাকড়ি কোথায় পেলি? তুই তো রাঁধুনিগিরি করিস? আবার বুঝি কাজ করছিস গেরস্থ ঘরে? মাইনে দেয় না?

—দেয়রে ভাই দেয়, কিন্তু বড়লোকদের জিনিস তো? শালারা টাকা দেখায়, হাতে বেশি দিতে চায় না!

পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া নন্দলাল বন্ধুর হাতে দিয়া কহিল, যা—

যাহা পায় তাহাই লাভ। মাকড়ির কথাটা গল্প মাত্র। চতুর ঠকে চতুরের কাছে।

৭

রাত হইয়া আসে। নন্দলাল ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার সেই রাত্রির আশ্রয়ে যায়। বস্তির মধ্যে পায়ের শব্দ পাইয়া মুখ তুলিয়া তাকাইল। নন্দলাল সম্মুখে আসিতেই বুড়ি বলিল, হুঁসিয়ার কিন্তু......ওরা আছে আশেপাশে... সাবধান!

—থাকবো, না যাবো?

—না থেকোনা বাছা...তোমাকে বাঁধলে আমারও ঠাঁই কয়েদখানায়। কালকের পয়সাটা দাওনি.. দিয়ে যাও।

নন্দলাল ক্ষিপ্রগতিতে পকেট হইতে হাত তুলিয়া বলিল, চার আনা পাওনা। একটা টাকাই নাও তুমি!

বুড়ি পান্তা ভাতের থালাটা কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, দিনকাল বুঝি ভালো যাচ্ছে? টুনিকেও কিছু দিয়ে যাওনা কেন?

সেই পতিতা মেয়েটির জানালায় নন্দলাল আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল। মেয়েটি সুসজ্জিতা। নন্দলাল হাত বাড়াইয়া পাঁচটি টাকা দিল। মেয়েটি এবার ভারি খুশি হইল। বলিল, ভেতরে এসোনা কেন?

সহসা কোথায় যেন গোলমাল শোনা যায়। নন্দলাল সচকিত হইয়া টুনির মুখের উপর বলিল, না, ঘেন্না করে!

কি যেন জবাব দিলো টুনি। নন্দলাল সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

৮

ঘুম ভাঙ্গিল পরদিন প্রভাতে। কিন্তু আশ্চর্য, প্রকাণ্ড একখানি ব্যারাক বাড়ির ছাদের পাশের বারান্দায় সে ঘুমাইয়াছিল। এ বাড়ির নিচে উপরে

বিভিন্ন ব্লকে অসংখ্য ভাড়াটের দল। কেহ কাহারও সম্বন্ধে উদ্বেগ ও কৌতূহল বোধ করে না। নন্দলাল এ বাড়িতে অনেক রাত্রে উঠিয়া আসিয়াছিল। এক ব্লক হইতে অন্য ব্লকে সে সন্ধান লইয়া ফিরিয়াছে, এক বারান্দা হইতে অন্য বারান্দায়। কেহ বাধা দেয় নাই, প্রশ্নও করে নাই। কেবল সেই দীর্ঘকায় দারোয়ানটা এক সময় কলাপসিবল্ গেটটি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তারপর সে বন্দী। নন্দলাল ফিরিয়া দেখিল, যাহাদের ব্লকে সে বন্দী,—তাহারা এখনই দরজা খুলিলে চোর বলিয়া ধরা পড়িয়া যাইবে। উঁকি দিয়া সে ভিতরে তাকাইল। ভিতরে সাড়াশব্দ হইতেছে, একটু পরেই কেহ হয়তো আসিয়া পড়িবে,—পলাইবার আর কোনো পথ থাকিবে না। পলকের মধ্যে নন্দলাল রেইন্ পাইপ ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল।

নিচে নামিয়া পা বাড়াইতেই দেখে, এটা উল্টা দিক। দরোয়ান প্রশ্ন করিতেই সে বলিল, সে ইন্‌স্‌পেক্টর—মিউনিসিপ্যালিটি হইতে ড্রেন তদন্ত করিতে আসিয়াছিল, বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে নালিশ হইবে। দারোয়ান সসম্ভ্রমে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল।

কিছুদূর গিয়াই সে গোরক্ষনাথের মন্দিরের আশেপাশে আসিয়া পড়িল। পার্বণ উপলক্ষে শত শত স্নানার্থীর ভিড় হইয়াছে জলাশয়ের চারিদিকে।

ভিড়ের চাপ হইতে বাহির হওয়া কঠিন।

আলুথালু হইয়া একটি স্ত্রীলোক ঘাট হইতে উঠিয়া আসিল। তাহার সর্বাঙ্গে অতিমূল্যবান অলঙ্কার। প্রতিটি অলঙ্কারকে নন্দলাল যেন কঠিন দৃষ্টিতে লেহন করিতে লাগিল। নিজের হাত সে নিজেই কচলাইতে থাকে। এমন সুযোগ সহসা আসে না। সে ফস্ করিয়া আগাইয়া যায়। ভিড়ের মধ্যে ঢোকে, স্ত্রীলোকের গায়ে গায়ে নিজেকে ছোঁয়ায়। একটি মুহূর্তও সময় লাগেনা এ সুযোগ গ্রহণ করিতে। তারপর একসময় ভিড়ের চাপ হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া আসে। তাহার হাতে অলঙ্কার। স্ত্রীলোকটির হুঁস নাই।

মেয়েটিকে সে দূর হইতে লক্ষ্য করিতে থাকে। মেয়েটি কাপড় ছাড়িল। শুদ্ধ বস্ত্রে ফুল আর নৈবেদ্য লইয়া মন্দিরে ঢুকিল। পূজা করিল। আঁচল হইতে

পয়সা লইয়া হাসিমুখে প্রণামী দিল। প্রসাদ মাথায় ঠেকাইল। সূর্যকে প্রণাম করিল। তারপর কমণ্ডুল হাতে লইয়া গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইল।

নন্দলাল গেল পিছনে পিছনে। পকেটে সোনার হারটি সে ভালো করিয়া একবার অনুভব করিল। বেশ ভারী নেকলেস্।

অনেকটা দূর। মেয়েটির তখনও হুঁস হয় নাই। রাজপথ ছাড়াইয়া বাঁ-হাতি গলি, গলি পার হইয়া একটি প্রাচীর। প্রাচীর ছাড়াইয়া ছোট নিরিবিলি ময়দান। ময়দানের সীমানায় একটি মেয়েদের স্কুল। সেখানে বালিকারা খেলা করিতেছিল।

স্কুলে আজ উৎসব। কোনো একটি বাড়িতে স্ত্রীলোকটি প্রবেশ করার ঠিক আগে নন্দলাল গিয়া সামনে দাঁড়াইল। বলিল, একটা কথা বলবো—

—মেয়েটি সভয়ে তাকাইল। কে আপনি ?

—আপনার কিছু হারিয়েছে ?

—আমার ? কই, না ?

—আপনার গলাটা দেখুন তো ?—

গলার কাছে হাত দিয়া মেয়েটি চমকাইয়া উঠিল। নন্দলাল পকেট হইতে হারছড়া বাহির করিয়া বলিল, এটি কি আপনার ? অপনি টের পাননি, পথের ওপর খুলে পড়ে গিয়েছিল। নিন্—

মেয়েটি হারছড়া লয়, তারপর অশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া গলির ভিতর দিয়া চলিয়া যায়।

৯

নন্দলালের মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। সামনের দোকান হইতে সে লজেন্স কিনিয়া আনে। তারপর ওই ময়দানের এক গাছতলায় দাঁড়াইয়া সে ছোট ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ করে। তাহারা ভিড় করিয়া আসিয়া আমোদে মাতিয়া উঠিল। লজেন্স কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল।

এমন সময় সেখানে একটি তরুণী আসিয়া পৌছিল। সে শিক্ষয়িত্রী।

তাঁহাকে দেখিয়া নন্দলাল চমকিয়া উঠিল। মেয়েটি অতি সুশ্রী। সে আগাইয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই নন্দলাল নমস্কার জানাইল। মেয়েটি সহাস্যে প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, কিছু বোলবেন?

—অভ্যাসমতো সহসা নন্দলাল মিথ্যা বলিল। আপনার কাছেই এসেছিলুম।

—কেন বলুন ত?

—এই ইস্কুলে মাস্টারীর জন্য আমি দরখাস্ত করেছিলুম!

—তরুণী স্মিতহাস্যে বলিল, কিন্তু এ স্কুলে তো কোনো কাজ খালি নেই?

নন্দলাল বলিল, এখানে এসে আমাকে দেখা করবার কথা বলা হয়েছিল, তাই এসেছি অনেক দূর থেকে!

—ভুল করেছেন। আমি এখানকার হেডমিস্ট্রেস্। আমি না বোললে আর কেউ বলবে না।

—তাহ'লে আপনার চিঠি পেয়েই এসেছি। ক্ষমা করবেন, আপনার নামটি কি?

আমার নাম ললিতা রায়।—আনত হাস্যে মেয়েটির মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

নন্দলাল বলিল, ঠিক তাই, ঠিক। আপনারই নাম ছিল সেই চিঠিতে,—কিন্তু কোথায় যে চিঠিখানা হারালুম! অনেক আশা নিয়ে, অনেক দিনের কল্পনা নিয়ে এসেছি! সকলের আগে গোরুর গাড়ি, তারপর নৌকো, তারপর ট্রেন······সে অনেক দূর!

ললিতা দুঃখ বোধ করে। বলিল, কিন্তু আপনি বোধহয় ভুল করেছেন,—আমি কোনো চিঠি লিখিনি তো? আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে, কে আপনাকে চিঠি লিখেছে। কোথাও একটা কিছু ভুল হ'য়ে থাকবে।

ললিতার আয়ত সরল চাহনির দিকে তাকাইয়া মুগ্ধ কণ্ঠে নন্দলাল বলিল, একবার ভেবে দেখুন······আমার জীবনের কতবড় আশা···যদি সুযোগ পেতুম, আমি বাঁচতে পারতুম, দাঁড়াতে পারতুম,—অন্ন দিতে পারতুম কতজনের মুখে!

হয়তো ভুল কোথাও আছে,—কিন্তু তার জন্য একটা পরিবার, একটা গোষ্ঠী, একদল লোক আজ কত বিপন্ন !

তাহার আবেগবিহ্বল চাহনির দিকে ফিরিয়া ললিতা বলিল, বাস্তবিক, কতদূর থেকে এলেন আপনি, কত কষ্ট পেয়েছেন ! কিন্তু কি করবো, আপনার জন্য কিছুই করতে পারছিনে ! ভারি দুঃখ হচ্ছে······

এমন সময় সেই পূজারিণী মেয়েটি স্বামীর সঙ্গে সেই দিকে আগাইয়া আসে। নন্দলালকে দেখিয়া দুইজনেই দাঁড়াইল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইল। ললিতা সব শুনিল। সোনার হারের কাহিনী শুনিয়া সপ্রশংস দৃষ্টিতে নন্দলালের দিকে তাকাইল। তারপর পূজারিণী মেয়েটির দিকে তাকাইয়া বলিল, সত্যি অবাক হ'য়ে গেলুম আপনাব কথা শুনে। ওঁর লোভ নেই···কত বড উনি ·

নন্দলাল বুঝিল অভিনয় নিখুঁত হইতেছে। মেয়েটি ওর ফাঁদে পা দিয়াছে,—এখন উহাকে প্রতারণা করা অত্যন্ত সহজ। মনে মনে নন্দলাল উল্লসিত হইয়া ওঠে।

স্বামী-স্ত্রী চলিয়া যাইবার পর ললিতা বলিল, আপনার জন্য কিছু করতে পারবো কিনা জানিনে···তবু আমাকে একটু সময় দিন, সেক্রেটারীকে একবার আপনার কথা বলি,—কাল একবার দয়া ক'রে আপনি আসবেন।

১০

নন্দলাল বিদায় লইল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাহাকে সোল্লাসে ঘিরিয়া থাকে। ললিতা উজ্জল হাসি মুখে নন্দলালকে লক্ষ্য করে। দূর হইতে পরস্পরের হাসি ও দৃষ্টি বিনিময় হয়।

নন্দলাল চলিয়া যাইবার পর ললিতা ছুটিতে ছুটিতে গিয়া তাহার বাবাকে পাকড়াও করিল।

—বাবা ?

—কি মা ?

—যাদের কাজ নেই, চাকরি নেই—তারা কি করে?

বাবা হাসিমুখে বলিলেন, পথে পথে ঘোরে!

—কিন্তু যদি তারা খুব গরিব হয়?

—তারা উপবাস করে। নয়তো তারা চুরি-ডাকাতি করতে বাধ্য হয়!—কিন্তু এসব নিয়ে তুমি বেশি মাথা ঘামিয়ো না মা।

ললিতা সোৎসাহে বলিল, শোনো বাবা, একজন লোক কাজ না পেয়ে উপোস ক'রে ঘুরছে,—কিন্তু পথে কুড়িয়ে পাওয়া সোনার জিনিসে তার লোভ হয়নি,—একি আশ্চর্য নয়?

ললিতা নন্দলালের সমগ্র কাহিনী বাবাকে শোনায়।

১১

সেক্রেটারির নিকট গিয়া ললিতা স্কুলটিকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য প্রস্তাব করে। তাহার সন্ধানে ভালো লোক আছে যাহারা কর্মী, যাহারা স্বার্থত্যাগী এবং সমাজসেবক, তাহারা গড়িয়া তুলিতে পারে একটা প্রতিষ্ঠান—যদি সুযোগ পায়।

সেক্রেটারি বলিলেন, স্কুলটি সবে মাত্র নার্সারি ক্লাস নিয়ে আরম্ভ হয়েছে। আপনারা মাত্র দুই জন। এখানে জায়গা কম, স্কুলকে বাড়ানোও যায় না। ফণ্ড খুবই সামান্য,—সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে—ইত্যাদি ইত্যাদি—

অনেক অসুবিধার কথা তিনি বলিলেন।

ললিতা বলিল, কিন্তু একজন ভদ্রলোক খুব ভাল ক'রে এখানে পড়াতে পারতেন।

—ভদ্রলোক!—সেক্রেটারি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, আমাদের নিয়মতন্ত্র মনে নেই আপনার? এখানে ভদ্রলোকের জায়গা কোথায়? এটা যে মহিলা-প্রতিষ্ঠান! মহিলা ছাড়া আর কারো ঠাঁই নেই!

ললিতা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

১২

নগরের রাজপথ কর্মচঞ্চল। যানবাহনে, লোকারণ্যে জীবন এখানে অতি দ্রুতগতি। সামনে যে বাসটা পাইল, নন্দলাল তাহাতে উঠিয়া পড়িল। এদিক ওদিক তাকাইয়া একটি মহিলার পাশে গিয়া সে জায়গা লইল। কিছুক্ষণ পরে মহিলা তাহার ভ্যানিটি ব্যাগ বাহির করিলেন। ব্যাগের ভিতর একটি আয়না লটকানো। মহিলা চোখ তুলিয়া আয়নার দিকে তাকাইয়া মুখে একবারটি পাফ্ বুলাইয়া কেতাদুরস্ত হইয়া বসিলেন।

নন্দলাল হঠাৎ মুখ বাড়াইয়া সেই আয়নাটুকুর মধ্যে নিজের মুখখানা দেখিবার চেষ্টা পাইল।

—কী?—মহিলা বিরক্ত হইলেন—কী চান?

ক্ষমা চাহিয়া নন্দলাল বলিল, না, কিছুনা। নিজের মুখখানা একবার দেখে নিচ্ছিলুম।

মহিলা ভ্রূকুঞ্চন করিলেন। নন্দলাল একটু অস্বস্তি বোধ করিয়া উঠিয়া গেল। বাস দাঁড়াইলে সে নামিয়া পড়িল। মহিলা সন্দিগ্ধ বিরক্তিতে তাহাকে লক্ষ্য করিতে থাকে। লোকটিকে তাঁহার ভালো বলিয়া মনে হয় না।

১৩

খেলাটি জমিয়াছে নন্দলালের মনে। সে কৌতুক বোধ করিল। দ্রুত-পদে সে চলিতে লাগিল। হঠাৎ দেখা হয় এক জুয়াড়ী বন্ধুর সহিত।

—ফুলবাবু হ'য়ে চললি কোথায় রে?

—সময় নেই···অনেক কাজ। পরে আবার দেখা হবে!

—বটে!—বন্ধু বলিল, উড়ছিস খুব আজকাল! নতুন শিকার বুঝি জালে ধরা পড়েছে? মোটা টাকা মারবি মনে হচ্ছে?

নন্দলাল থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, টাকা নয়, ভালোবাসা!

—ভালোবাসা!—বন্ধু হাসিয়া উঠিল, ভূতের মুখে রামনাম!

ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া নন্দলাল ছুটিয়া পলাইল। পিছন হইতে বন্ধু বলিল, বুঝতে পারছি, আগে যা ছিল তার চেয়েও বিপজ্জনক হ'য়ে উঠলো।

১৪

নন্দলাল আসিয়া ললিতার ওখানে পৌছাইল। কিন্তু দেরি হইয়া গিয়াছে। তখন প্রায় সন্ধ্যা। এদিক-ওদিক খোঁজ করিয়া একটা প্রবেশপথ পাওয়া গেল। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই হঠাৎ সে ললিতার বাবার সামনে আসিয়া পড়িল।

—কে ?

গতকল্যকার পরিচয় দিয়া নন্দলাল দাঁড়ায় ও নমস্কার করে। মিস্টার রায় হাসিলেন। বলিলেন, বুনো হাঁসের পিছনে দৌড়াচ্ছ, ধরতে পারবে কি বাবা ?

নন্দলাল থতমত খাইয়া বলিল, আজ্ঞে, মানে—কি বলছেন ?

রায় বলিলেন, মাস্টারী কি পাবে এখানে ? তাই বলছি,—কই, নানি—?

ভিতর হইতে সাড়া দিয়া রাঁধুনী আসিয়া দাঁড়াইল। নন্দলালের আপাদ-মস্তক দেখিল। মিঃ রায় বলিলেন, ললিতা কোথায় ?

—বাগানের ওদিকে।

—এ দেখা করতে চায়।

নানি নন্দলালকে ডাকিয়া লইয়া বারান্দা দিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু মাঝ-পথে ললিতার সহিত দেখা হয়। ঝুমকো ফুলের গোছা ললিতার খোঁপায়। নানি সহাস্য মুখে চলিয়া যায়। নন্দলাল বলিল, আপনাকে আবার বিরক্ত করতে এলুম।

—বিরক্ত ? মোটেই না। আমি সারাদিন আপনার কথাই ভাবছিলুম।

—সত্যি !—নন্দলাল নাচিয়া উঠে। কেউ ভাবে তাহার কথা !

ললিতা বলিল, আসুন ওদিকে যাই,—আশ্চর্য কাল থেকে পেয়ে বসেছে শুধু আপনার কথা ! আপনার কথায় কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি !

ললিতার কানে দুটো হীরের ফুল, গলায় দামী মুক্তোর মালা। হাতে কঙ্কা বাঁধা বাজু,—টানিলেই খোলা যায়। সব মিলাইয়া অনেক টাকা দাম! নন্দলাল যদি এগুলি পায়, অবে অন্তত পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সে বেশ বিলাস-ব্যসনে কাটাইতে পারে।

বাগানের দিকে দুজনে আসে। একটু অন্ধকার, একটু জ্যোৎস্না জড়ানো। ললিতা নির্ভয়ে একা আসিয়া দাঁড়াইল। ছায়ায় আলোয় দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতে থাকে তাহার অঙ্গের অলঙ্কার,—দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে নন্দলালের লুব্ধ চক্ষু।

নন্দলাল বলিল, আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ হ'লো, এবাব কিন্তু আপনার স্বামীর সঙ্গে আমি আলাপ ক'রে যাবো।

আমার স্বামী?—ললিতা তাহার দিকে তাকাইয়া সহসা খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল,—আমার স্বামী! কি বলছেন! স্বামী! বাজারে অর্ডাব দিয়ে আপনার জন্য তৈরি ক'রে আনাবো? স্বামী পাবো কোথা?—আসুন, বসি গাছতলায়।

ওরা আসিয়া বসে। অনেক আলাপ হয়।

একসময় ললিতা বলিল, আপনার বাড়ির গল্প বলুন। সত্যি, আমি কি অদ্ভুত, এখনও আপনার পরিচয় নিইনি। কে কে আছেন আপনার বাড়িতে?

হঠাৎ মিথ্যে কথা মুখে জোগায় না। নন্দলাল বলিল, বাড়িতে! ও। কিন্তু দুঃখী গরিবের খবর নিয়ে আপনি দুঃখ বোধ করবেন—এ আমি চাইনে।

ললিতা বলিল, আপনার কথা সেক্রেটারীবাবুকে বলেছিলুম, এরা কিন্তু চায় না। আপনার মতন শিক্ষিত ভদ্রলোক পেলে ইস্কুলের কত সুবিধে হোতো! আচ্ছা, এখানে কোথায় আপনি থাকেন? কেমন ক'রে চলছে আপনার!

নন্দলাল চুপ করিয়া থাকে।

ললিতা অনুতপ্ত হইল। বলিল, না, না, থাক্‌—আমার অন্যায় হয়েছে! আমাকে বলুন, আমি কী করতে পারি আপনার জন্যে!

নন্দলালের চোখের সামনে ঝলমল করিতে থাকে লাবণ্যের ললিত সারল্য! তাহার গলা বুজিয়া আসে। সে ঢোক গিলিল। বলিল, না, ব্যস্ত হবেন না—আমি কিছু চাইনে।

আর যেন এখানে থাকিতে তাহার সাহস হয় না। অন্ধকার এই উদ্যান-শোভা যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। গন্ধ জড়ানো ছায়াচকিত জ্যোৎস্না রাত্রি। নন্দলাল উঠিবার চেষ্টা করে।

ললিতা বলিল, না, তা হবে না। আপনি চ'লে গেলেই তো সেই নিরুদ্দেশ! থাকুন আর একটু। আচ্ছা বলুন তো পৃথিবীতে কেন এত দুঃখ, মানুষ কেন এত কষ্ট পায়, কেন তাদের এত দুর্গতি?

নন্দলাল চমকিয়া ওঠে তাহার কথায়! সে বলিল, মানুষের দুর্গতি মানুষেরই তৈরি!

মানুষ কেন পাপ করে, বলতে পারেন?

জানিনে, তবে পাপের জন্ম বোধ হয় লোভের থেকে!

ললিতা মন দিয়া শোনে নন্দলালের কথা। কি যে ভালো লাগে। এক সময় বলিল, আমি যখন একলা থাকি, কি ভাবি জানেন? মানুষকে এত সুন্দর ক'রে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই ঈশ্বর না জানি কত সুন্দর!

নন্দলাল বলিল, মানুষ সুন্দর, কে বললে আপনাকে?

ললিতা বলিল, আমি নিজের মনে খুঁজে বার করেছি। জন্তুরা নোংরায় থাকে, কিন্তু মানুষ নোংরা ঘেঁটেও এক সময় পবিত্র হ'য়ে এসে দাঁড়ায়,—সেই তো মানুষের দাম!

আর সহ্য করা যাইতেছে না। নন্দলাল বলিল, এবার আমি যাই।—

ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু বলিল, আজ আপনাকে শূন্য হাতে যেতে দেবো না। কিছু না হ'লে কেমন ক'রে চলবে আপনার? এই হীরের আংটিটা নিয়ে যান্—

হাত কাঁপিয়া উঠিল নন্দলালের। কম্পিত কণ্ঠে বলিল, এ আপনার দয়া, না দান?

ললিতা বলিল, না কোনোটাই নয়! ওইটুকু যে আমার অধিকার! নইলে কিসের জোরে আবার আপনাকে আসতে বলবো?

স্তব্ধ চক্ষে নন্দলাল চাহিয়া থাকে। তাহার পা সরে না।

ললিতা হাসিমুখে বলিল, একালের মানুষেরা কেবল কাজের কথাই কয়। যাকেই দেখি, সেই কাজের মানুষ। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, এর বাইরে আরো কিছু আছে। কিছু বড়, কিছু মহৎ! কই নাম বললেন না তো! বাড়ির খবর দিলেন না?

নন্দলাল বলিল, বেশ তো আরেক দিনের জন্য তোলা থাক। কিন্তু বার বার আমি এলে আপনার কাজ নষ্ট হ'বে যে! আপনি যা আমাকে ভাবছেন, আমি হয়তো সেরকম হয়ে উঠতে পারব না!

তাহোক, বলুন কবে আসছেন আবার। আপনি রোজ আসুন, আমার বাবা খুব খুশি হবেন!

হাতের মুঠোর মধ্যে নন্দলালের আংটিটা ঘর্মাক্ত হইয়া ওঠে। অন্তত চারশো কি পাঁচশো টাকা দাম। সে যেন এই আংটিটা লইয়া নড়িতে পারিতেছে না। কিন্তু আংটি কেন? মুক্তোর মালাটা মন্দ কি? হীরে বসানো হাতের বাজু অনেক দামী। নন্দলাল একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখে, কেউ কোথাও নাই। একা ললিতা। একটা কিছু ছিনাইয়া লইয়া চীৎকার করিবার আগেই সে বাগান পার হইয়া অদৃশ্য হইতে পারিবে। তাহা ছাড়া যাহাকে এমন সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাইতেছে, তাহাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিতেও মেয়েটার বাধিবে। হটাৎ গলা টিপিয়া ধরিলে দেখিবে না কেউ। সমস্ত আভরণ একে একে খুলিয়া লইতে দুইমিনিট মাত্র। তারপর এই অন্ধকারে তরুণীর মৃতদেহ পড়িয়া থাকিবে,—ইতিমধ্যে কেউ আসিবে না!

পলক মাত্র। হঠাৎ এক পা আগাইয়া কঠিন মুঠিতে নন্দলাল ললিতাকে ধরিল। তাহার লুব্ধ চক্ষু ধকধক করিতেছে। ললিতা চমকাইয়া ওঠে। কিন্তু মুহূর্তের ঘটনা! নন্দলাল হাসিমুখে বলিল, না, তা হবে না,—এ আংটি

আমি নিতে পারবো না। কখনও যে লোক কিছু দিতে শেখেনি, নেবার অধিকার তার কোথায়? আমি যাই—

নন্দলাল ললিতার আঙুলে আবার আংটিটা পরাইয়া দিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছিল। পিছন হইতে ললিতা বলিল, কই, আজও নাম বললেন না তো? কি ব'লে ডাকবো আপনাকে, কি নামে ভাববো?—শুনুন, আস্‌ছে সাতাশে তারিখে আসা চাই কিন্তু—মনে রাখবেন!

বাগানের মাঝখানে একবার উত্তেজিত ও হাস্যোদ্ভাসিত মুখে নন্দলাল দাঁড়ায়, তারপর হাতের ইসারায় বিদায় জানাইয়া চলিয়া যায়!

১৫

নন্দলাল একপাশে আসিয়া বসিয়াছে। আশেপাশে কানাকানিতে জানা যায় আগামীকাল সামনের ওই মস্ত বারোয়ারী আটচালায় বক্তৃতা করিতে আসিতেছেন আচার্য ওঙ্কারানন্দ স্বামী,—এইখানে তাঁহার অভ্যর্থনা হইবে। স্বামীজি আসিতেছেন বৃন্দাবন হইতে। হাজার লোকের জমায়েত হইবে। হঠাৎ পাশের লোকটির দিকে তাহার চোখ পড়িল। ভাবে সে গদগদ, আবেগে উদ্বেল, ভক্তিরসে আপ্লুত। সম্ভবত ব্যবসায়ী। সব কাজ সম্পূর্ণ করিয়া অবসর-বিনোদনের জন্য মন্দিরে আসে। ওপাশে একটি তরুণ ছোকরা অলক্ষ্যে অদূরবর্তী একটি তরুণীর প্রতি ইসারা বিনিময় করে। এই তো সুযোগ। ভাবাপ্লুত ব্যক্তি হেঁট হইয়া প্রণাম করিতে গেল। তাহার বুক পকেট হইতে কিসের একটি তাড়া কোলের সামনে পড়িয়া গেল। কৌশলে বাঁ হাতে নন্দলাল সেটি টানিয়া লয় এবং কথকের দিকে ভাবমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ডান হাতে তরুণের পকেট হইতে মণিব্যাগটি তুলিয়া আনে।

তারপর নিরীহ ও নিস্পৃহ নন্দলাল একসময় করজোড়ে প্রণাম জানাইয়া বাহিরে চলিয়া যায়। বহুদূরে গিয়া সে তাড়াটি খোলে এবং মণিব্যাগটিও হাতড়ায়। তাড়ার মধ্যে পাওয়া গেল প্রায় একশো টাকা এবং একটি কাগজ-মোড়া খানিকটা আফিং। মণিব্যাগের মধ্যে সে পায় কয়েক আনা পয়সা এবং

একখানা চিঠি। তাহাতে লেখা—দোকানের চাবি আমার কাছে রইলো। উনত্রিশ তারিখে খোঁড়া সর্দার বুড়ো তোমার ওখানে যাবে। টাকাকড়ি ওর হাতেই দিয়ে দিয়ো। নিচে নাম সই, আর ঠিকানা।

১৬

এদিকে নিজে হাতের আংটিটি লইয়া ললিতা নিজেই নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। নন্দলালের আকুল-ব্যাকুল চাহনি সে ভুলিতে পারিতেছে না। আবার সে আসিবে কিনা বলিয়া যায় নাই। ললিতা একবার জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। গুণ-গুণ করিয়া গান ধরিল। তারপর ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাইল। সাতাশ তারিখ এখনও অনেক দেরি।

রায়সাহেব ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ললিতা উঠিয়া গিয়া বলিল, বাবা, সেই ভদ্রলোকের নামটা আমি শুনিনি। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে বাবা?

রায়সাহেব হাসিয়া বলিলেন, আমি ভাবছিলুম আমিই জানবো তোমার কাছে।

পিতা ও কন্যা উভয়েই হাসিয়া উঠিল। গৃহিণীর হাসিও দেখা গেল দেওয়ালের একখানা ছবিতে। রায়সাহেব বলিলেন, নানি বলছিল, বৃন্দাবন থেকে ওঙ্কারস্বামী আসছেন এক সভায়। তোমার নাকি সেখানে যাবার ইচ্ছে?

ললিতা কাছে উঠিয়া আসিয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল, তুমি কিন্তু কিছু বলোনা বাবা, ওই সব আমার খুব ভালো লাগে। কাগজে কী লিখেছে জানো? ওঙ্কারস্বামী দশ বছর হিমালয়ে তপস্যা করেছেন!

রায়সাহেব বলিলেন, যে বস্তু আমার জানার বাইরে, তা যে অসম্ভব সে-কথা তো আমি বলিনে, মা? বেশ যেয়ো তুমি!

১৭

বারোয়ারী তলার বিরাট জনতা চারিদিক হইতে জয়ধ্বনি করিয়া ওঠে। আচার্য ওঙ্কারনন্দ স্বামী আসিয়া পৌছিয়াছেন। বহুলোক হৈ চৈ করিতেছে। ভক্তরা তাঁহাকে ঘিরিয়া লইয়া আসিতেছে। চঞ্চল হইয়া ওঠে দর্শক সাধারণ। সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফাররা ছবি তুলিয়া লয়।

আচার্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে মঞ্চের উপর। কি কমনীয় মুখশ্রী! মনে হয় সমগ্র মুখমণ্ডলে তারুণ্যের দীপ্তি। দুই চক্ষে স্বপ্নাবেশ। সর্বাঙ্গে গৈরিক আলখাল্লা—হাত দুইখানিও ঢাকা। মাথায় ব্রহ্মচারীদের মতো টুপি—দুই কান ও গালের পাশ হইতে নিচে নামিয়াছে—মিশনারী নানদের মতো। চোখে নতুন ধরনের ফ্রেমে বাঁধা চশমা। জ্ঞানী ও সাধকের সমস্ত লক্ষণ চোখেমুখে পরিস্ফুট। আচার্য বক্তৃতা শুরু করেন।

ললিতা মুগ্ধদৃষ্টিতে বক্তৃতা শোনে। জীবন কী, সাধনার কী অর্থ, পথ কোথায়, মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার আছে কিনা, প্রেমের মধ্যে ভগবানের স্বরূপ, বিশ্বজগতের কল্যাণ—ইত্যাদি বিষয়ে তাহার অশ্রুতপূর্ব ভাষণ শুনিয়া জনসাধারণ বিস্ময়-বিমুগ্ধ।

এমন সময় আসরে হৈ চৈ উঠিল। আরেকজন ওঙ্কারানন্দ স্বামী এখানে আসিয়াছেন। তিনি বয়োবৃদ্ধ। এখানে আজ তাঁহার ভাষণ দেওয়ার কথা। তিনিও আসিতেছেন বৃন্দাবন হইতে। তবে যান-বাহনের গোলমালের জন্য তিনি ঘণ্টা দেড়েক বিলম্বে আসিয়াছেন। আর কোনো উপায় ছিল না।

দর্শক সাধারণ উত্তেজিত হইয়া ওঠে। বৃদ্ধ আচার্যের বিরুদ্ধে বহু লোকে কদর্য উক্তি করে। এমন চমৎকার আসরকে নষ্ট করার জন্য এ একটা বিরোধী দলের চক্রান্ত মাত্র। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ আচার্য তাঁহার নিজের দুই-একটি কথা বলিতে চান। কিন্তু কেহই রাজি হয় না। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া দলবল সহ স্থানত্যাগ করিলেন।

ওদিকে মঞ্চের উপর ভাষণরত আচার্যের পায়ের কাছে অজস্র টাকা-পয়সা প্রণামীস্বরূপ পড়িতে থাকে।

আসর ভাঙ্গিবার পর আবেগ-উদ্বেলিত ললিতা আচার্যের দিকে অগ্রসর হয়। শত শত লোকের ভিড় ঠেলিয়া সে আর নানি আচার্যের কাছে আসে। একজন ভক্ত সমস্ত প্রাণামীগুলি একটি ঝুলিতে ভরিয়া আচার্যের সঙ্গে দেয়।

ললিতা যখন তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি আশীর্বাদ করিলেন—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।

শত শত লোকের জয়ধ্বনির ভিতর দিয়া আচার্য ও তাঁহার একটি সংগীকে গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইল। গাড়ি চলিয়া গেল। প্রায় ঘণ্টা খানেক পর্যন্ত গাড়ির চালক এরাস্তা ওরাস্তা ঘুরিয়া আরোহীকে বারংবার প্রশ্ন করিয়াও সাড়া পাইল না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া গাড়ি থামাইয়া একসময় চালক নামিয়া আসিল। একটি দরজা খোলা, স্বামীজি ভিতরে নাই, সম্মুখে একটি শূন্য ঝুলি, এবং বসিবার জায়গাটিতে আচার্যের সেই সংগীটির অচেতন দেহ এলাইয়া পড়িয়াছে।

পথের একটি অন্ধকার কোণে আসিয়া আচার্যের ছদ্মবেশ ত্যাগ করিতেই ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল নন্দলাল। রাত অনেক। কিছুদূর গিয়া সে এদিক-ওদিক তাকাইয়া গেরুয়ার পুঁটলীটি রাখিয়া আসিল এক গঞ্জিকা-সেবী সাধুর ধূনি জ্বালানো আসনের পাশে। মাথাটা একবারটি ঠুকিয়াও লইল পাথরে। তারপর রাস্তা পার হইয়া মধ্যবিত্ত একটি হোটেলের ঘরে গিয়া গুনগুন করিয়া গান ধরিল।

পরদিন সংবাদপত্রগুলিতে আচার্য ওঙ্কারের ওরফে নন্দলালের ছবি ও ভাষণের সঙ্গে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হইল: সভায় নকল আচার্যের কুকীর্তি; জনসাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ: প্রণামী অর্থতহবিল সহ আচার্যের পলায়ন। প্রকৃত ওঙ্কারানন্দের বিবৃতি!

১৮

পুলিশ স্টেশনের দপ্তর কর্মচঞ্চল হইয়া উঠে। সামনের কাঁচ-বাধানো বোর্ডের মধ্যে নন্দলালের পরপর চারটি ছবি টাঙ্গানো রহিয়াছে। প্রত্যেকটি তাহার ছদ্মবেশ। একটির মাথায় ক্যাপ ও গোঁফদাড়ি, একটি আচার্য ওঙ্কার, আর একটির গালকাটা ঠোঁটপুরু ভয়ানক চেহারা।

পুলিশ কনস্টেবল, দারোগা, কর্মচারী সহ ডেপুটি কমিশনার তাঁহার ঘরে তুমুল উত্তেজনায় আলাপ চালাইতেছিলেন।

ডেপুটি কমিশনার হইলেন স্বয়ং ললিতার বাবা মিঃ রায়।

তিনি বলিতেছিলেন, একই লোক—আমি বিশ্বাস করিনে। যাই বলুন আপনারা—

স্যার, আমরা কিন্তু একমত। একই লোক—এছাড়া হ'তে পারেনা। ভালো ক'রে দেখুন, স্যার···আগাগোড়া একই ধরনের ক্রাইম এবং একই ধরনের পালাবার কায়দা। যাবার সময় কোনো ক্লু, রেখে যায় না,—হাত-পায়ের একটি অস্পষ্ট দাগও না!

চারখানি ফটোগ্রাফ লইয়া সবাই মিলিয়া আগাগোড়া বিচার করিতে থাকেন। কিন্তু রায়সাহেবের মনে একবারও সন্দেহ হয় না যে, এই অপরাধী সেই ব্যক্তি,—যে ছোকরার সহিত তাঁহার কন্যার এত ঘনিষ্ঠতা।

রায়সাহেব যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, ললিতা তখন স্কুলে গিয়াছে। তিনি সবেমাত্র মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়াছেন—এমন সময় সেই পূজারিণী ও তাহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রায়সাহেবের সহিত তাঁহারা বিশেষ-ভাবে পরিচিত। নানাকথার পর তাঁহারা বলিলেন, আপিসের কাজ নিয়েই তো আপনার সারাদিন যায়······একটু সময় আপনার নেই, কাকাবাবু। কিন্তু তাই ব'লে ললিতা শুধু ইস্কুল মাস্টারী নিয়েই থাকবে? অমন চমৎকার মেয়ে—

রায়সাহেব সস্নেহ হাস্যে বলেন, তোমাদের কথায় যে একটু-আধটু

আঁচ পাচ্ছিনে তা নয়, তবে তোমাদের প্রস্তাবটা কী একবার বলো, শুনি।

আপনি সাহস দিলে তবে তো বলতে পারি কাকাবাবু!

রায়সাহেব আবার অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন। বলিলেন, হয়তো তোমরা যা ব'লতে পাচ্ছনা, আমি সেটি আগেই ভেবেছি।

মহিলা বলিলেন, এ বিয়ে যদি হয় তবে সকলের পক্ষেই আনন্দের কথা কাকাবাবু!

রায়সাহেব বলিলেন, ছেলেটিকে আমি দেখেছি, কথাও বলেছি। আমার ভালোই লেগেছে। কিন্তু কোনো কিছু পরিচয় না নিয়েই তোমরা একাজ করতে বলো?

ভদ্রলোক বলিলেন, পাত্রীই হোক আর পাত্রই হোক—তার নির্ভুল সত্য পরিচয় কখনও কোনো পক্ষের কি পাওয়া সম্ভব কাকাবাবু?

সে কথা সত্যি, তবে কি জানো—

মহিলা বলিলেন, তার স্বভাব-চরিত্র যা প্রকাশ পেয়েছে, সেইটিই তার আসল পরিচয় কাকাবাবু—তাছাড়া আমি ললিতাকেও জানি, তার চেয়ে সুখী আর কে হবে বলুন!

রায়সাহেব হাসিয়া বলিলেন, বেশ, আমার মেয়ে যদি সুখী হয়, তবে আমিও সুখী হব এ-বিয়েতে!

নানি থালা হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল, আমরা গরিব লোক, আমাদের কথার দাম নেই। কিন্তু যার নাম-ধাম পর্যন্ত জানা গেলনা,—তার সঙ্গে মেয়ের বে' দেওয়া—একটু ভেবে চিন্তে নিও, বাছা। মেয়েটাকে হাতে ক'রে আমি মানুষ করেছি।

রায়সাহেব হাসিয়া উঠিলেন—সে তো বটেই নানি। তবে ছেলেটি যেমন লাজুক, তেমনি ভদ্র। অতকথা জানতে গেলে ছেলেটি যদি আড়ষ্ট হ'য়ে এ বাড়ীতে আনাগোনা বন্ধ করে?

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। নানি বলিল, আপনি হলেন পুলিশের বড়কর্তা,

আপনার চেয়ে মানুষকে বেশী আর চেনে কে? যাকে জামাই করতে যাচ্ছেন, সে এ বাড়িতে আনাগোনা করলে পায়ের আওয়াজ পাইনে,—তাই বলছিলুম।

রায়সাহেব বলিলেন—তোমাকে বোধ হয় একটু ভয় পায়!

উপস্থিত সকলে হাসিয়া উঠিল।

১৯

ভালোবাসা!—শ্যামাপদ নন্দলালের দিকে তাকায়। বলিল, বলিস কি রে? সহ্য করতে পারবি? তাড়ি খেয়ে জীবনটা কাটালি, সোমরস সইবে?

নন্দলাল চিন্তিত মনে চাহিয়া থাকে।

শ্যামাপদ বলিল, তোকে চেনে? পরিচয় জানে তোর? চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, জখম, জুয়া—জালিয়াতি,—ইতিহাসগুলো কি সব বলেছিস?

সমস্ত জীবনের স্খলন-পতনের কাহিনীগুলি নন্দলালের মনে আসে। শান্ত কণ্ঠে সে বলিল, আমি বললেও সে বিশ্বাস করবে না!

মুখ বাঁকাইয়া শ্যামাপদ বলিল, এতই ভালোবাসা! বুঝতে পেরেছি, এইবার তোর শেষ। কিন্তু সাবধান, এখনও বলছি—ভদ্রঘরের মেয়েকে ছুঁতে যাসনে! তুই যা আছিস তাই ভালো। বেশ তো ক'রে খাচ্ছিস! ভালোবাসায় পড়তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি ভালোমন্দ জ্ঞান ফিরে আসে, যদি মায়া-দয়ার ফাঁদে পা দিস্?—তবে কি তোর আখেরে অন্ন জুটবে? এখনও সাবধান!

ভারাক্রান্ত ও চিন্তিত মনে নন্দলাল চলিয়া যায়।

শ্যামাপদ আপন মনে বলে, এইবার মরেছে! প্রেমের ফাঁদে পড়েছে! কিন্তু শালা যদি হঠাৎ ধার্মিক হয়ে সব কবুল করে তবে তো আমিও মরবো ওর সঙ্গে। নিজে মরবে, আমাদেরও ভোগাবে! হে ভগবান—

২০

পিয়ানো বাজাইতেছিল। হঠাৎ সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নন্দলালকে দেখিতে পাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ললিতা বলিয়া উঠিল—এত দেরী, এত দেরী করলে যে তুমি?

তুমি! অদ্ভুত সম্ভাষণ বটে! কাঁপিয়া উঠিল নন্দলাল।—তুমি তো ঘড়ি ধ'রে ব'লে দাওনি, কখন আসবো?

কত লোক এসেছিল এতক্ষণ—সবাই চ'লে গেল। তুমি থাকলে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতুম। ভাবলুম সাতাশ তারিখ, হয়তো তোমার মনে নেই!—নানি, ও নানি, এখানে একবার এসো।

নানি ওধার হইতে সাড়া দিল।

নন্দলাল সহাস্যে বলিল, এত সাজসজ্জা যে আজ?

জানো না?—ললিতা বলিল, আজ যে আমার জন্মতিথি। সবাই এলো একে একে,—সবাইকে বলেছি তোমার কথা। তোমাকে দেখবার জন্য কী ইচ্ছে সকলের।—আচ্ছা, কখনো শুনেছ তোমার-আমার এরকম গল্প? কাব্যে? রামায়ণে? মহাভারতে? কে তুমি,—কোথায় ছিলে, কী পরিচয়,—কিছু জানা নেই। কিন্তু হঠাৎ তুমি এলে—শীতের শেষে যেমন হঠাৎ আসে বসন্তের ঝলক, হঠাৎ আসে নাগকেশরের গন্ধ-ঘন গাঢ় ঘুমের মধ্যে, হঠাৎ আসে স্বপ্নের ছায়া! তুমি এলে তাই যেন আমার এতদিনকার ঘুম ভাঙলো, তুমি এলে তাই দুঃখ জাগলো—

নন্দলাল বলিল, দুঃখ কেন?

এতদিন আসনি তুমি, তাই দুঃখ—!

ললিতার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। নানি খাবার লইয়া ঘরে ঢুকিল। হাসিমুখে তাকাইল নন্দলালের দিকে। তারপর বলিল, জামাইবাবু, তুমি বাড়ি এলে পায়ের আওয়াজ পাইনে কেন?

পাওনা?—নন্দলাল সহাস্যে বলিল, কানে বুঝি একটু খাটো?

খিলখিল করিয়া হাসিয়া ওঠে ললিতা—কেমন হয়েছে, কেমন হয়েছে নানি? আর লড়াই করতে আসবে?

নানি স্নেহহাস্যে চলিয়া গেল। নন্দলাল বলিল, সব বুঝলুম, কিন্তু জামাইবাবু কথাটায় রহস্য র'য়ে গেল!

ললিতা তাহার দিকে তাকাইয়া সহসা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, জানালার ধারে গেল, পিয়ানোর রীড্‌গুলির উপর দিয়া আঙুল চালাইয়া দিল,—তারপর নিশ্বাস রোধ করিয়া কী যে করিবে বুঝিতে পারিল না।

নন্দলাল কী যেন একটা বলিবার চেষ্টা করিল।—শোনো ললিতা, একটা কথা আছে···আমি বলতে চাই যে—

আবেগভরে ললিতা বলিল, নানি তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পায়না··· কিন্তু আমি যে আওয়াজ পাই বুকের মধ্যে দিনরাত···সমস্ত জীবন-যৌবন পদ্মপত্রের মতো থর থর,—একি তুমি বুঝতে পারনা?

না, পারিনে ললিতা!—নন্দলাল কাঁপিয়া ওঠে।

ললিতা উদ্বেল আবেগে বলিল, পারো না, তবে চলো বাইরে—তুমি ঘরের নও, বাইরের,—আকাশ যেখানে অনেক বড়,—যেখানে তারায় তারায় তৃষ্ণাতুর অন্ধকার চাপা কান্নায় কাঁদতে থাকে! চলো বাইরে যাই—

জড়োয়া জহরতে ঝলমল করে ললিতা! নন্দলালকে সে বাহিরে টানিয়া লইয়া যায়।

শ্যামাপদর কথাগুলি নন্দলালের মাথায় ভিড় করিয়া আসে। তোকে চেনে? পরিচয় জানে তোর? চুরি, ডাকাতি, জুয়া-জালিয়াতির ইতিহাস বলেছিস?

সরোবরের ধারে আসিয়া ললিতা নন্দলালের হাত ধরিয়া বসাইল।

—শোনো, মস্ত একটা মজার গল্প আছে তোমার জন্য। শুনতেই হবে তোমাকে।

নন্দলাল বাধা দিয়া কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, কিন্তু আমার কথাটা তোমার না শুনলেই চলবেনা যে?

—তোমার কথা? আমার মাথা আর মুণ্ডু! বাবাকে আমি বলেছি! দেখবে তখন, কিছু ভাবতে হবেনা! আমার বাবা মস্ত বড় অফিসার, তা জানো?—যাকগে শোনো। সেদিন গিয়েছিলুম ওঙ্কারস্বামীর সভায়! লোকটা অদ্ভুত! আমার মনের কথা সব বলেছে, ঠিক যেমন তুমি বলো। আমি কিন্তু একদৃষ্টিতে চেয়েছিলুম তাঁর দিকে। ভাবছিলুম তোমাকে! যেন তোমারই কথা! তোমার মতন ভঙ্গী, তোমারই মতন মধুর। তিনি আর তুমি,—যেন তোমরা দুই এক, দুই অভিন্ন! সেদিন আনন্দের অসহ্য যন্ত্রণায় আমি দিশেহারা হ'য়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলুম।

উদ্‌গ্রীব হইয়া নন্দলাল বলিল, তারপর?

তারপর?—ললিতার চোখে আবার বাষ্প জমিয়া উঠিল। বলিল,—বাড়ি এসেছিলুম কিন্তু মনে নেই কিছু—হয়তো বুঝিনি সব, তবু তোমাকে ছাড়া কিছু ভাবিনি। তোমাকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবা যায় না।

নন্দলাল আতঙ্কিত হইয়া ওঠে!

ললিতা এবার শান্ত কণ্ঠে বলিল, পরদিন কগেজে দেখি, সে লোকটা নাকি প্রতারক, পুলিশ তাকে খুঁজছে!—

ললিতা আরো কাছে সরিয়া আসিল।—আচ্ছা বলতে পারো, মানুষ বিনা কারণে অপরাধ করে কেন? বলতে পারো মানুষ তার নিজের সত্য পরিচয়কে শতপাকে কেন বেঁধে রাখে?

জলের মধ্যে দু'জনের ছায়া কাঁপিতেছে। গলা পরিষ্কার করিয়া নন্দলাল বলিল, এমনও হ'তে পারে তুমি আমাকে যা ভাবছো আমি তা নই!

সেই তো আনন্দ!—ললিতা বলিল, মন দিয়ে গড়েছি তোমাকে, প্রাণ দিয়ে তোমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছি,—তুমি যতখানি তার চেয়ে অনেক বেশি ক'রে তোমাকে পেয়েছি।

নন্দলাল কিছু বলিতে যায় অমনি বাধা পড়ে। কিন্তু আর নয়, এবার নন্দলালকে সরিয়া যাইতে হইবে। এমন পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের কাছে নন্দলাল বিপন্ন।

উহারা উঠিয়া আসিল। নন্দলালকে কথা দিতে হয়, আবার কবে সে আসিবে। প্রতিক্ষণ পথ চাহিয়া থাকিবে ললিতা। ভালোবাসার আবেগে দূর হইতে দেখা যায়, বেদনায় ও বাসনায় আপ্লুত তাহার দুই চোখ।

২১

রায়সাহেব সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন। নানি যাইতেছিল রান্নাঘরে। রায়সাহেব প্রশ্ন করিলেন, পায়ের আওয়াজ কি আজকাল পাওয়া যাচ্ছে নানি?

নানি থমকাইয়া দাঁড়াইল। বলিল, বাড়িতে জামাই আসুক,—ভালোমন্দ হওয়া সে হ'লো ভাগ্য। আমি বলতে গিয়ে কেন নিমিত্তের ভাগী হই বড়বাবু?

তাহ'লে একটা আয়োজন করা যাক। তোমার দিদিমণি কী বলে? দিন স্থির করবো?

নানি বলিল, নেমন্তন্ন চিঠি ছাপতে দেবেন, কিন্তু ছেলের নাম ধাম তো আজও জানা গেল না। ওই যে আসছে দিদিমণি!

ললিতা আসিয়া ঢুকিল। বাবার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। রায়সাহেব তাঁহার কন্যার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, মন দিয়ে শোনো মা, ছেলেটির জন্য একটি কাজ ঠিক করেছি। মাইনে ভালোই পাবে। কিন্তু ওর নামধাম দিয়ে একটা দরখাস্ত পাঠাতে হবে তো?

ললিতা বলিল, সত্যি, আমারও মনে থাকেনা বাবা। কিন্তু শুনেছি উনি বড় ঘরের ছেলে·· চারদিকে নামডাক—গাঁয়ের মস্ত জমিদার-বংশ ··

গাঁয়ের পথে নন্দলালকে দেখা যায়। হাঁটিতে হাঁটিতে চলিয়াছে। এই গ্রামে তাহার বাল্যকাল কাটিয়াছে। সামনে সেই প্রাচীন ভিটা,—সেখানে ঘুঘুর ডাক। কেহ কেহ তাহাকে চেনে।—তুমি না সেই নন্দ, যজ্ঞেশ্বরের ছেলে। তোমার কীর্তির কথা কে না জানে বলো? এখানে আবার কেন?

সেই প্রাচীন কানাই মোড়ল এখনও বাঁচিয়া আছে। তবে ঘরামির কাজ

আর করে না। তাহার সঙ্গে দেখা হইল। বৃদ্ধ পায়ের ধূলা লইল নন্দলালের। বলিল, মানুষ ছোট কাজ করে, কিন্তু মানুষ তো আর ছোট নয়—কি বলো দাদা ?

নন্দলাল আবার একদিকে হাঁটিতে থাকে। সেই হাটতলা, সেই শিরিশ পালের ঘানিঘর, ওধারে সেই ডাকঘরের চালাটা,—এধার দিয়া বাঁশবাগান ছাড়াইলেই নায়েব মহাশয়ের কাছারি। দেখিতে দেখিতে সে চলিয়া যায়। সবই আছে, কিন্তু কী যেন নাই। এমন কিছু সে হারাইয়াছে যাহার জন্য বিষণ্ণ হাওয়ার হাহাকার চলিয়াছে চারিপাশে।

নন্দলাল তাহাদের পুরানো ভিটায় আসিয়া [illegible]বার বসিল। গাঁয়ের অচেনা অল্পচেনা মেয়ে-পুরুষ হাট ভাঙ্গিবার পর [illegible]াইতেছে। নন্দলাল আবার একসময় উঠিয়া চলিতে লাগিল। আপন [illegible]তে তাহার ঠাঁই নাই। দূর পথে সে চলিয়া যায়।

২২

নানির গলার আওয়াজ পাইয়া ললিতা ছুটিয়া বাহিরের দিকে আসিল। কে যেন ডাকিতেছিল! কাহার যেন কণ্ঠস্বর! না সে ভুল করিয়াছে। নানি বাড়ি নাই, তাহার ভাইপোর অসুখ শুনিয়া সে চলিয়া গিয়াছে।

না, কেহ নহে।

একজন খোঁড়া বৃদ্ধ লোক গাছতলায় দাঁড়াইয়া। বোধ হয় কিছু ভিক্ষা চায়। দুর্দশায় লোকটি কি হতশ্রী! ললিতার দয়া হয়। ভিতরে গিয়া দেখে ঠাকুর তাহাকে থালায় করিয়া খাইতে দিয়াছে। থালাসুদ্ধ তুলিয়া আনিয়া সে ভিখারীকে দেয়।

দূরে রায়সাহেব আসিয়া দাঁড়াইয়া হাসেন।— কী হচ্ছে মা ?

ললিতা বলিল, বড় গরিব বাবা, হয়তো কিছু খায়নি।

ভিখারী অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে আশীর্বাদ জানায়। তারপর পরম আগ্রহে খাইতে বসিয়া যায়।

ললিতা ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। ঘর বড় শূন্য,—শূন্য চারিদিক। পিয়ানোর উপর আঙুল বুলায়,—কিন্তু কিছু ভালো লাগে না। ভিতর হইতে কেমন একটা বেদনা যেন আঘাত করিতেছে,—সেটা চোখের জলে নামিতে চায়।

খোঁড়া ভিখারী লাঠি লইয়া চলিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া ট্যাঁকের ভিতর হইতে একটি ঠিকানা বাহির করিল। তারপর পথের এদিক-ওদিক তাকাইয়া একটি বাড়ির ভিতর ঢুকিল।

মস্ত বাড়ি। চাকর[illegible]র আছে এপাশে-ওপাশে। উহাদের একজনকে একখানা চিঠি দিয়া [illegible]দাঁড়াইল কিছুক্ষণ। খানিক পরে একটি ভদ্রলোক উপর হইতে নামি[illegible]সলেন। তিনি বলিলেন, তোমার নাম বুঝি জগু সর্দার?

খোঁড়া ব[illegible]জ্ঞে হ্যাঁ—

ভদ্রলো[illegible] হইতে তিন শত টাকা উহার হাতে দিলেন। বলিলেন, কাঁচা টা[illegible]বধানে নিয়ে যাবে, বুঝলে? এই নাও চিঠি। রমেশকে দিও। এই হ'লো শেষ কিস্তির টাকা। আমার কাছে আর কিছু পাওনা রইলো না, —বুঝেছ? যাও—

খোঁড়া সর্দার আস্তে আস্তে বাহির হইয়া চলিয়া যায়। নিজের মনেই সে সে হাসিল। প্রসাধন-সজ্জা তাহার নিখুঁত হইয়াছে!

সে আসিল সোজা শ্যামাপদর ওখানে। তাহাকে দেখিয়া শ্যামপদ বলিল, ব্যস্, ফাঁড়া কেটে গেছে তোর, সুবুদ্ধি হয়েছে! আরে ভাই, ওসব ভালোবাসার কারবার বড়লোকদের জন্যে। আমরা চুনোপুঁটি, আদার ব্যাপারী—আমাদের জীবনে ওসব বেমানান।

ঠিক বলেছিস শ্যামাপদ। ওসব আমাদের ধাতে সয় না। কেবল কান্নাকাটি আর কথার হেরফের,—আসল কাজ কিছু নেই।—নন্দলাল বলিল, হৃদয়ের কারবারে লাভের চেয়ে লোকসান বেশি!

হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস—শ্যামাপদ বলিল, লাখ কথার এক কথা। সোজাসুজি

ব্যাপারটা বুঝি। মেয়েমানুষ চাস? বেশ! দশ বিশ টাকা নিয়ে বেরোলি, ঘরে ঢুকে পছন্দসই দুটোকে নিয়ে টানাটানি করলি, দুটো নাচগান শুনলি,— হয়তো এক ফাঁকে নেশার ঝোঁকে দুটো প্রাণের কথাও ক'য়ে নিলি,—ব্যস্ দু'ঘণ্টার কারবার। ঝাড়া হাত-পা নিয়ে ঘরে ফিরে এলি।—এইবার তোর বুদ্ধি খুলেছে!—চল্, এই তো রাস্তা,—এক হাত বাজি খেলে যাই। ট্যাঁকে আছে কিছু?

নন্দলাল হাসিয়া বলিল, চল্—

দু'জনে জুয়ার আড্ডায় ঢুকিল। নানা অদ্ভুত লোক সেখানে। দিন কি রাত বলা কঠিন। সে এক নতুন জগৎ। ঝুপসি, স্যাঁতসেঁতে, ময়লা মেয়ে-পুরুষ নানা জাতের, বিকট গন্ধ, অদ্ভুত ধরনের আসবাব,—তাহাদের মাঝখানে বসিয়া ময়লা তাস খেলা হয়।—

নন্দলাল হারিতে লাগিল। আজ তাহার কপাল মন্দ। কিন্তু খেলা যখন জমিয়াছে, তখন একসময়ে সে উঠিয়া পড়িল। প্রায় সব টাকাকড়ি তাহার বাহির হইয়া গেল। এ রকম বড়মানুষী করিতে অনেক কাল কেহ তাহাকে দেখে নাই। কিন্তু সে যখন তাহার শেষ নোটের গোছাটা শ্যামাপদর হাতে দিল, তখন সবাই অবাক হইয়া গেল।

—কী হ'লো রে?

—না কিছু না।

– যাস কোথা?

—যাই, ভালো লাগছে না।

নন্দলাল বাহির হইয়া গেল। শ্যামাপদ তাহার পথের দিকে তাকাইয়া বলিল, শালা প্রেমে পড়েছে!

আরেকজন বলিল, পড়েছে কি মরেছে!

২৩

অনেক রাত। বৃষ্টি হইতেছে। আকাশে মেঘ ডাকিতেছে। পথে কেহ নাই। মাঝে মাঝে বাইরে ঝড়ের গোঙানি শোনা যাইতেছে।

ঘরের মধ্যে খাইতে বসিয়াছেন রায়সাহেব আর ললিতা। খাওয়া প্রায় শেষ। রায়সাহেব বলিলেন, কিন্তু তুমি যদি তাকে এতই বিশ্বাস করো, তবে সে তোমাকে একটা খবরও দিচ্ছে না কেন?

বাবা!

রায়সাহেব কন্যার দিকে তাকান।

ললিতা বলিল, এমনও হ'তে পারে খবর দিতে তিনি পাচ্ছেন না। হয়তো সুস্থ নেই। হয়তো—

কি জানো মা, এমন কোনো চিহ্ন নেই—যার সূত্র ধ'রে আমি নিজে কোথাও লোক পাঠাবো। অথচ, এদিকে আমি নিজে তৈরি হচ্ছি।

জানালার বাহিরে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে নন্দলালের মাথাটা উঁচু হইয়া উঠিল। তাহার সেই খোঁড়া জগু সর্দারের নিখুঁত প্রসাধন।

আহারাদি সারিয়া রায়সাহেব বাহিরে চলিয়া যান। প্রবল বৃষ্টি হইতেছে। ললিতা স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকে। তারপর উঠিয়া গিয়া পিয়ানোর সামনে বসে।

নানি বলিল, অঙ্কে মিলছে না, বুঝলে দিদিমণি? যে মানুষ এত কাছের, সে এত দূরে গিয়ে চুপ করে থাকে কেন? তার মন নেই? বুকের তলার কল্‌জে নেই? সে কি পাথর?

ললিতা বলিল, অমন ক'রে বলতে নেই, নানি! হয়তো আমার মধ্যে ত্রুটি আছে, হয়তো তার উচিত মূল্য আমিই দিতে পারিনি!

তাহ'লে এখন কী করবে?

অপেক্ষা করবো!—ললিতা বলিল।

অপেক্ষা করবে? কতদিন?

কম্পিত কণ্ঠে ললিতা বলিল, জানিনে···কিছু জিজ্ঞেস ক'রোনা, নানি। যতদিন সে না আসে,—হোক সে এক যুগ, যুগের পর যুগ, জন্ম থেকে জন্মান্তর।

ললিতা কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল পিয়ানোর উপর। তারপর সে গান ধরিল। কি যন্ত্রণা সেই গানে,—শরবিদ্ধ পক্ষীশাবকের রুদ্ধ আবেগের স্বর,—সেই গানের মধ্যে যেন অনাদি অনন্তকালের বিচ্ছেদের বেদনা!

জানালার বাহিরে নন্দলাল প্রবল ঝঞ্ঝা-বারিধারার মধ্যে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া সেই অমৃতনিস্যন্দিনী কণ্ঠ শোনে।

একান্ত একাগ্রভাবে ললিতা সেই গানটি গাহিল। গান শেষ হইলে খোঁড়া সর্দারের মাথাটা জানালার বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল।—

কিছুক্ষণ পরে সেই ঘন দুর্যোগময় ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত্রির অন্ধকারের ভিতর দিয়া একটা প্রবল কলরোল শোনা গেল। সবাই চমকাইয়া উঠিল। ললিতা ছুটিয়া আসিল বাহিরে, গলার সাড়া দিয়া অগ্রসর হইলেন রায়সাহেব, ওদিক হইতে উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিল নানি। চাকরবাকর ছুটাছুটি করিতে লাগিল এবং ঘরের মধ্যে ঝনঝন করিয়া টেলিফোন বাজিয়া উঠিল।

২৪

বেতারে একটি গান হইল। গানের পর পুলিশ-স্টেশনে অফিসারদের মাঝখানে একটি খবর ঘোষণা করা হইল। "গতকল্য কোনো একসময় অতি কুখ্যাত এক জুয়াড়ী ও জালিয়াৎ জেলপলাতক-কয়েদী নন্দলাল ওরফে চাঁদমহম্মদ ওরফে গুরুচরণ নিজদলের এক ব্যক্তির আক্রমণে হত হয়। হত্যাকারী নিজেও একজন খোঁড়া বৃদ্ধ ভিখারীর ছদ্মবেশে ঘোরে। সম্ভবতো ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও বিদ্বেষ এই হত্যার অন্যতম কারণ। হতব্যক্তির আপন দলের লোকেরা দলপতির মৃতদেহসহ পলায়নে সমর্থ হয়। প্রকাশ, উক্ত হত্যাকারী জগু সর্দার নামে পরিচিত এবং তাহার একখানি ফটো পুলিশের

াতে রহস্যজনকভাবে আসিয়া পড়ে। কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, পুলিশের কর্মতৎপরতা ও তদন্তের ফলে এই ঘটনার আনুপূর্বিক রহস্য শীঘ্রই উদ্‌ঘাটিত হইবে।”

পুলিশের কর্তারা আপন আপন আসনে হতচকিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন। কেবল সেই কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো বোর্ডের মধ্যে নন্দলালের চারখানি ছদ্মবেশের ফটোর পাশে একজন কন্‌স্টেবল আসিয়া জগু সর্দারের একটি ছবি লট্‌কাইয়া দিয়া গেল।—একজন আরেকজনের সঙ্গে মুখ চাওয়াচায়ি করিল।

২৫

রাত্রে নিজঘরে রায়সাহেব চঞ্চল ও অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে থাকেন। সামনে নন্দলালের পাঁচখানি ছদ্মবেশের ফটো। পুলিশ হইতে অদ্যাবধি তাহাব স্বাভাবিক ফটো সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। একই লোক কিন্তু প্রত্যেকটি ভিন্ন। ইহাদের আড়ালে একটিমাত্র অপরাধী?

ঘরের ওধারে ললিতা ছবিগুলির দিকে তাকাইয়া কী যেন ভাবিতে থাকে!

টেবিলের উপর ঘুষি ঠুকিয়া মিঃ রায় বলিলেন, আশ্চর্য! তোমার আমার দু'জনের চোখে ধুলো দিয়ে গেল, একটু সন্দেহ হ'লো না?

ললিতা জগু সর্দার অর্থাৎ খোঁড়া ভিখারীর ফটোখানার দিকে অনিমেষ চোখে তাকাইয়া রহিল। তারপর একসময় সে হাসিল। তারপর বলিল, বাবা, যে ব্যক্তি খুনে সে ভিক্ষে করে কেন?

রায়সাহেব বলিলেন, মানুষের চরিত্রের কোনো রহস্য জানা গেল না মা।—এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। দূরে গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পায়ের শব্দ মিলাইয়া যায়।

সহসা বাহিরে কেমন একটা পতনের আওয়াজ—তাহার পরই শোনা যায় কলরোল। ললিতা চমকাইয়া উঠিল। চমকাইয়া উঠিলেন রায়সাহেব। নানি দূর হইতে সাড়া দিল। চাকরবাকর মহলে হৈ চৈ উঠিল।

রায়সাহেব বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন।

ললিতা দ্রুতপদে নামিয়া আসিল। এত রাত্রে আতঙ্কিত হইয়া প্রাণভয়ে নানি দরজা বন্ধ করিয়া বিছানার মধ্যে ঢুকিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

একটা লোক—হয়তো বা চোর উপর হইতে পা পিছলাইয়া পডিয়া যায়। লোকটি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। মাথাটা রক্তাক্ত!

চোর নয়—সেই ভিখারী! সেই দাড়ি, সেই পাকাচুল,—সেই ক্ষত বিক্ষত মুখ,—সেই জগু সর্দার।

চমকাইয়া ওঠেন রায়সাহেব, শিহরিয়া ওঠে ললিতা!

লোকটাকে ঘরের মধ্যে আনা হইল। পিঠের দিকে আঘাত লাগিয়াছে। মুখখানিও কেমন যেন বিকৃত।

এইবার একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ধরা পড়িল ভাবিয়া রায়সাহেব মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। নির্দ্দেশ দিলেন—এ খবর বাইরে যেন না যায়, হুঁশিয়ার!

রায়সাহেব তাঁহার পকেটের রিভলবারটি একবার পরীক্ষা করিয়া লইলেন।

আহত লোকটিকে অন্যঘরে আনা হইল। হঠাৎ ললিতা ডাকিয়া উঠিল, বাবা?

রায়সাহেব বলিলেন, কেন মা—

লোকটাকে দেখ ভাল ক'রে? চেনা মনে হচ্ছে?

রায়সাহেব নিজে আসিয়া পরীক্ষা করিলেন, তারপর লোকটির মাথার উপর হইতে পরচুলা খুলিয়া ফেলিলেন। ললিতা আর্তকণ্ঠে বাবাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পিতা স্তব্ধ, বিস্মিত, অন্য সকলে বিমূঢ়, হতবাক্।

রাত ভোর হইয়া আসিতেছে।

নন্দলাল বলিল, ওরা ছদ্মবেশকেই জানে, আসল মানুষকে চেনে না! তুমি আবিষ্কার করেছ আমাকে তোমার ভালোবাসায়, তোমার মহিমায়!

ললিতার চোখে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

জীবন নিয়ে খেলা করতুম, সে খেলা তুমি ভাঙ্গলে...তোমার ভালবাসা... তোমার বিশ্বাস...তোমার সরলতা। ক্ষমা কর, ললিতা! আমার সব মিথ্যে, নামটাও মিথ্যে...আমার নাম নবকুমার!

নানী আড়ালে গিয়া চোখের উপর আঁচল দিল!

ললিতা নবকুমারের বুকের উপর নিজের অশ্রুসিক্ত মুখ রাখিল। তুমি আমাকে শক্তি দাও, তোমার সমস্ত স্খলন-পদন, পাপ-পূণ্য নিয়ে তোমার পাশে দাঁড়াবার অধিকার দাও!

রায়সাহেব আসিয়া পাশে দাঁড়াইলেন। নবকুমারের কপালে হাত রাখিয়া বলিলেন, তোমার অপরাধ নয় বাবা! তোমাকে যে মাথা উঁচু করে বাঁচতে দেয়নি—সেই আধুনিক সমাজ এর জন্ত দায়ী! তুমি ভয় পেও না!

জহুরীর জহর।

শেফালী হইতে শিউলী। তাহার পর দেখিতে দেখিতে হইল শিলি। যাহারা নতুন মানুষ, নামটা শুনিয়া তাহারা মুখ চাওয়া-চায়ি করে। নামের কোনো মাথামুণ্ড নাই, তাই বোধ করি ইহার ইংরাজি অর্থটাই মানায় ভালো।

শিলি বড় হইয়াছে, তাহার বিবাহ আর না দিলেই নয়। অত বড মেয়ের দিকে আর চাওয়া যায় না। মানে, যখন দেখিতে ইচ্ছা করে তখনই চাহিতে নিষেধ। আত্মীয়-স্বজনের ভিতরে কুমারী যুবতীব আদর নাই, কারণ, তাহার দিকে চাওয়া যায় না, অর্থাৎ, চাহিয়া দেখিলে পাছে মন খুশী হয, সেজন্য চক্ষুকে সতর্ক পাহারায় রাখা।

শিলির বিবাহের কথাটা পাকা হইয়া উঠিতেছে, কারণ, বি-এ পাশ করিবার পর তাহার মা হওয়া ভিন্ন আর কাজ নাই। তাহার চেহারার এপিঠ ওপিঠ মা হইবার দিকেই ঘেঁষিয়াছে, ইহার পর দেরী করিলে লক্ষনগুলি শুকাইতে থাকিবে। মেয়েদের যৌবনটা কাজের চেয়ে প্রযোজনেব পথ ধরিয়া চলে। — ফুল ফুটিয়াছে, ভোমরাকে ডাক দিয়া আনো।

ঘটক আসিয়া জানাইল, পাত্র প্রস্তুত। বিলাতের জাহাজ হইতে বোম্বাইতে নামিয়া দেশে আসিয়া পৌছিতেছে। হৃষ্টপুষ্ট, অল্পবযস, ধনীব সন্তান। অমন পাত্রকে ফেলিলে ভবিষ্যতে দুঃখ আছে। গণ, কুল, শীল, গোত্র—কোথাও অমিল নাই। ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার। নাম শচীশ। বযস ছাব্বিশ। ঘটক তাহার ফটো দেখাইল। অপছন্দ হইবার মতো চেহারা নয়।

হাজার দশেক টাকার বেশি লাগিবে না। শিলিব বাবা রাজি হইলেন।

ছোট পিসিমা আড়ালে শিলিকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। খুব আয়োজন ও ঘটা করিয়া প্রচুর পরিমাণে ভূমিকা করিয়া বলিলেন, এবারে আপত্তি কবলে আর শুনবো না শিলি!

কে শুনতে বলছে তোমাদের?—শিলি কহিল।

পছন্দ হয়েছে ত? বল্?

শিলি হাসিয়া দিল। তারপর সমবয়সী পিসিমার গলা ধরিয়া কহিল, শাঁখ বাজিয়ে দাও।

ছোট পিসিমা কহিলেন, আমিও তাই বলি। বি-এ পাশের পড়াটা কেবল সৎপাত্রের জন্য অপেক্ষায় থাকা।

শিলি কহিল, না গো পিসি, না। ডিগ্রিটা হচ্ছে একটা অলঙ্কার। পরলে চক চক করে, মানায় ভালো। তারপর আর কি, বইগুলো ধ'রে দিয়েছি উই পোকার মুখে, কেটে ফেলুক।

ছোট পিসিমা তাহার এলো খোঁপাটা টানিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। অর্থাৎ ইহা মেয়েমানুষেরই কথা, গ্রাজুয়েট মেয়ের কথা নয়।

শাঁখ বাজিতে দেরী ছিল কিন্তু আয়োজন চলিতে লাগিল। পাত্রপক্ষের নিকট খবর গেল, দেনাপাওনার আলোচনা প্রায় মিটিয়া আসিল। বাবা পাত্র দেখিয়া পছন্দ করিয়া আসিলেন। ও-পক্ষের স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া পাত্রী দেখিয়া ভুরি-ভোজন করিয়া গে লন।

বিলাত-ফেরৎ পাত্র হইলেও বিলাতী ফ্যাশনটা সঙ্গে আনে নাই। সকলের চেয়ে অশ্চর্য্য যে, শচীশ বাংলা ভাষায় কথা বলে, এবং গুরুজনদের সম্মান করে। তাহার প্রসঙ্গ শুনিয়া শিলি ভাবিল, লোকটা স্বদেশী চাল্ চালিয়া প্রশংসা আদায় করিতেছে; যথা সময়ে শাসন করিলেই চলিবে।

বরপণ ছাড়াও অলঙ্কারের কথাটা আছে। একটি মাত্র মেয়ে, সুতরাং কার্পণ্য করিবার কোনো কারণ নাই। অলঙ্কার নির্ম্মাতাগণের নিকট অর্ডার গেল। যাহারা মণিমুক্তা লইয়া কারবার করে তাহাদের ডাক পড়িল। নানা জনে নানা উপহার দিবে।

রতিপতি রায় কোম্পানীর লোক আসিল। তাহারা জড়োয়া ও জহরতের কারবার করে। কলিকাতায় তাহাদের যথেষ্ট নাম। তাহাদেরই প্রতিনিধি-স্বরূপ একটি যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল।

ছেলেটির বয়স অল্প। তাহার লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া মাকড়া চুলে যেমন তেলও নাই, তেমন চিরুণীও কোনোদিন পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রংটা শাদা, মুখের কাটুনিটা মেয়েলি ছাঁদের, কেমন একটা অদ্ভুত লাবণ্যে তাহার মুখ চোখ কোমল। বড় বড় কালো দুইটা তারার উপরে ঘন কালো পল্লব। এক মুখ পাণ খাইয়াছে, জামার কাপড়ে ও চিবুকে সেই পাণের রস পড়িয়া রাঙা হইয়া আছে। শার্টের কলার এলোমেলো। তাহাকে দেখিয়া রাগ হয়, স্নেহ হয়। ছেলেটা বর্ব্বর, কিন্তু সুন্দর।

পরণে তাহার জরিপাড় দামী শিমলার ধুতি, কিন্তু বেশ বুঝা যায় অসাবধানে পথে কোথাও ছিঁড়িয়া আসিয়াছে; পায়ে মখমলের জুতা, কিন্তু অযত্নে তাহাও জরাজীর্ণ।

শিলি কটুকণ্ঠে কহিল, খাঁটি জিনিস এনেছ ত?

ছোক্‌রা পাণ চিবাইতে চিবাইতে হাসিল। যেমন অসভ্য তাহার চাল-চলন, তেমন সুন্দর তাহার মুখশ্রী। বয়স বাইশ তেইশের বেশি নয়। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, জহরতের কারবার না করিয়া সিনেমায় গিয়া অভিনয় করিলেই মানাইত।

ছোট পিসি কহিল, তুমি এত ছেলেমানুষ, তোমার হাতে যে কোম্পানী বিশ্বাস ক'রে জিনিস পাঠালে?

ছোকরা কহিল, ছেলেমানুষ কি গো ঠাকরুণ, আমি খুব গুণী লোক।

সবাই হাসিয়া উঠিল। কাঁচা বয়সের মুখে পাকা রসিকতা শুনিলে পুরুষরা চটিয়া যায়, মেয়েরা খুশি হয়।

ছোকরা পুনরায় কহিল, বিশ্বাস করবে না কেন, আমি যে কোম্পানীর এক অংশের মালিক।

এ বুঝি তোমার বাপের কারবার?

একটা কৌটা বাহির করিয়া তাহা হইতে পাণ ও সুগন্ধী-জরদা বাহির করিয়া ছোকরা মুখে পুরিল, তারপর কহিল না, ঠাকুর দাদার।

ছোট পিসি কহিল, তোমার নাম কি?

রমাপতি রায়। বলি, কা'র বিয়ে হবে? তোমার বুঝি?

ছোট পিসি একটা ধাক্কা খাইল। তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিতে লাগিল। সে যে বালবিধবা একথা ছেলেটি বুঝিতে পারে নাই। শিলি মুখ ঝামটা দিয়া কহিল, যে-কাজে এসেছ সেইদিকে মন দাও, পরের ঘরের কথা কেন?

রমাপতি কহিল, তোমার বিয়ে বুঝি?

থামো, জানিনে।

রমাপতি হাসিল। কহিল, আমার ঘরের কথা শুনবে আর তোমাদের কথা জানতে চাইবো না কেন?

তাহার যেন কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই, সে পাণ মুখে করিয়া চিবাইতেই অস্থির। দেখিয়া মনে হয় অনেকদিন স্নান করে নাই, শীতের হাওয়ায় হাতে পায়ে ধূলা ও ময়লা জমিয়া উঠিয়াছে। চেয়ারে বসিয়া অসভ্যের মতো হাত পা দোলাইতে দেখিলে মনটা তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে।

ছোট পিসি কহিল, বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে অমন ক'রে কথা বলে না। তুমি লেখাপড়া করেছ কতদূর?

সামান্য।—রমাপতি কহিল, ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত। পাশ করতে পারিনি। পরীক্ষা দেবার আগে শিঙ্গাপুর পালিয়ে গিয়েছিলুম।—বলিয়া নিজের আনন্দে সে হাসিতে লাগিল।

তাহার চোখের ভিতরে প্রাণের কেমন একটা অদ্ভুত আলো ঝলমল করিতেছিল, জীবনের একটা বিচিত্র নিবিড় নেশায় সর্ব্বক্ষণ টলমল করিতেছে। তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার কৌতূহল যেমন অপরিসীম তাহার সহিত কথা বলিতে গেলেও তেমনি ভয় করে। কি জানি, বেপরোয়ার মতো কোন্ কথাই বা বলিয়া বসে!

এমন সময় বঙ্কিমবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমাপতি উঠিয়া নমস্কার করিল না দেখিয়া শিলি আহত হইল; তাহার এই ত্রুটি শিলি যেন নিজেরই

লজ্জা বলিয়া মনে করিল! ইচ্ছা হইল, এই সামান্য সৌজন্যটুকু সে ওই ছেলেটাকে শিখাইয়া দেয়।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কি চলতে পারে?

রমাপতি কহিল, পারে বৈ কি, আমিই ত মালিক। বলিয়া সে কোটের ভিতরের পকেট হইতে এক গোছা শাদা মুক্তার মালা বাহির করিল।

সকলে মিলিয়া সেগুলি যখন নাড়াচাড়া করিতেছে, শিলি তখন রমাপতির দিকে তাকাইল। রমাপতি তাহার দিকে চোখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, বেশ মানাবে।

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, কা'কে?

আপনার মেয়েকে। ভালো চেহারা কি না, এই বেশ খাটবে। এই দেখুন না, এর ভেতর থেকে আভা ফুটছে নীল, এর আশ্চর্য্য গুণ। রোদে রাখুন, দেখবেন রামধনুর রং—অন্ধকারে নিয়ে যান্, দেখবেন আলো বের হচ্ছে। এটার দাম বেশি নয়।

কত?

বারো শ' টাকা। এটা নেবেন? এই যে, এর রং সোনার মতন। বিকাল বেলায় পরলে মনে হবে এর মধ্যে জল টলটল করছে। সকালের আলোয় দেখতে পাবেন দুধের মতন শাদা। যারা নতুন বৌ হবে এটা পরলে তারা বরের ভালোবাসা পায়।

ছোট পিসির সহিত শিলি মুখ রাঙা করিয়া মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেল। ইহার মুখের সম্মুখে দাঁড়াইলে বিপদে পড়িতে হয়। বঙ্কিমবাবু কহিলেন, জিনিস বেচতে হ'লে তোমাদের এই সব কথা বলতে হয় নাকি হে?

সত্যি কথা।—রমাপতি বলিতে লাগিল। মুক্তো হাতে নিয়ে মিছে কথা বল্‌ব আপনার কাছে? আমি সাধারণ খদ্দেরের কাছে আসিনে মনে রাখবেন। নেটিভ-প্রিন্সদের ঘরে আমার কাজ। তারা দু'হাজার, পাঁচ হাজার টাকার মাল নেয় না। ভালো জিনিস নিয়ে গেলে তারা গররাজি

হয়েও পঞ্চাশ হাজারের মাল কেনে। পাতিয়ালা আর বিজানগরকে আমি এই সেদিন পাঁচ লাখ টাকার মাল গছিয়েছি।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, আমি ত আর অত দামের জিনিস কিনতে পারবো না!

কেন, আপনি ত বড়লোক!

বঙ্কিমবাবু হাসিলেন। কহিলেন, পরের টাকা সবাই বেশি ছাখে। আরে, এ যে আমার কন্যাদায়। সোনার জিনিসের কিছু কাজ আছে তোমার কাছে?

আছে বৈ কি! বলিয়া রমাপতি অন্য পকেট হইতে দামি পাথর বসানো সোনার টায়রা বাহির করিল।

শিলি দরজার বাহিরে গিয়া সন্ত্রস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এবার পুনরায় ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। রমাপতি কহিল, বসুন। আপনারই ত এখন জয় জয়কার। কত গয়না, কত মণিমুক্তো, আপনার এখন অনেক দাম।

'তুমি' হইতে বাবার 'আপনি' হইল। ছেলেটাব বোধ হয় মাথায় দোষ আছে। কিন্তু কিছু না বলিয়া চেয়ারখানা একটু দূরে টানিয়া বাবার পাশে গিয়া বসিল।

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, তা যেন হোলো, শিলির এখন খুব দাম বুঝলুম কিন্তু এত দামী জিনিস নিয়ে ঘুরে বেড়াও, প্রাণের ভয় নেই? ধরো, এই কল্‌কাতা শহর!

ওঃ এই কথা।—রমাপতি কৌটা হইতে পুনরায় স্ফূর্ত্তি বাহির করিয়া খাইল, তারপর বলিল, মোটরে ঘুরি, হাঁটিনে। যখন বিদেশে যাই তখন পকেটে রিভল্‌ভার থাকে।

কে কে আছেন তোমার?

উত্তর শুনিবার জন্য শিলি মুখ তুলিল। রমাপতি বলিল, বিশেষ কেউ না, মাত্র আমরা দুই ভাই, আমি ছোট। মা বাবা নেই।—ভালো বিপদ দেখি আপনাদের নিয়ে, মাল কিন্‌বেন না, কেবল কুলুজি ঘাঁট্‌বেন, এ কি?

শিলি কহিল, আমার পছন্দ হচ্ছে না বাবা।

রমাপতি কহিল, অবাক করলেন। পছন্দ না হ'লে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, অন্য জিনিস আন্‌বো। যতক্ষণ না পছন্দ হয়,—ঠিক কোন্ জিনিসটি চান্ বলুন, তবে আমি ঠিক আন্‌তে পারব।

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, নীলা আর হীরে, তার সঙ্গে এনো ভালো ব্রেসলেট। মুক্তোর মালা আরো বড় চাই। টায়রা আন্‌বে হীরে বসানো। তোমার জিনিস সব খাঁটী ত?

রমাপতি তাহার জিনিসপত্র গুছাইতে গুছাইতে বলিল, আপনার নিজের জহুরীকে আনবেন মশাই, তিনিই সব দেখে নেবেন। ইচ্ছা করলে ঠকাতে পারি, তবে কি জানেন, ঠকাতে ভালো লাগে না।

হাসিয়া বঙ্কিমবাবু কহিলেন, কেন?

টাকায় আমাদের অরুচি। যাক্ উঠি,—তাহ'লে আবার কাল আসতে হবে, কেমন?

আমার মেয়ের পছন্দ মতন জিনিস এনো।

পছন্দ না হ'লে ছাড়বোই না।—বলিয়া রমাপতি উঠিয়া দাঁড়াইল। পকেট ভরিয়া সে জিনিস লইয়াছে।

বঙ্কিমবাবু চলিয়া যাইবার পর শিলি কহিল, তোমার আঙুলের আংটিটার দাম কত?

এই আংটিটা?—বলিয়া রমাপতি তাহার সুন্দর বলিষ্ঠ হাতখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কহিল, এর দাম অমূল্য!

কেউ বুঝি উপহার দিয়েছে?

আরে, রামো। এ আংটির পাথর দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমার এক সাহেব বন্ধুর কাছে কিনেছি।

কত দিয়ে?

প্রায় ছ' হাজার টাকা। আচ্ছা, একটা কথা বল্‌ব?

শিলির গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। কি কথা, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না। সে কেবল মুখ তুলিয়া চাহিল।

রমাপতি হাসিমুখে কহিল, চমৎকার তুমি! তোমাকে দেখলে মানুষের প্রাণের মূল পর্যন্ত কাঁপতে থাকে। এত রূপ!

শিলি অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। এই তরুণ জহুরীর কাছে তাহার নিজের চেহারা যে কিছুই নয়! সহস্র সুন্দরীর লাবণ্য দিয়া আঁকা এই রূপকুমারের মুখশ্রী,—ইহার কাছাকাছি দাঁড়াইলে নিজের গায়ে যেন আলো পড়ে। কিন্তু পথের লোক হইয়া তাহার রূপের প্রশংসা হঠাৎ করিয়া বসিল কেন? গোপনে কি ইহার কিছু মতলব আছে?

কি যেন বলিতে গিয়া শিলি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একবার চারিদিকে চাহিল, তারপর হঠাৎ ছুটিয়া ভিতরে গিয়া ঢুকিল।

লেখাপড়া জানা মেয়ের মুখের উপর পথের একটা লোক এমন করিয়া বলিয়া গেল, অথচ তাহাকে তিরস্কার করিতে মন উঠিল না। এমন ঘটনা শিলির জীবনে ঘটে নাই। সে স্কুলে গিয়াছে, কলেজে যাতায়াত করিয়াছে, অনেক সময়ে অনেক ছেলে পথে-ঘাটে তাহার অনুসরণ করিয়া নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছে কিন্তু স্পষ্ট করিয়া শিলির মনে কেহ দাগ ধরাইতে পারিয়াছে, এমন কথা স্মরণ হয় না। বাহিরের জীবনটা তাহার সংযত, কোনো কিছুতেই সে ভ্রূক্ষেপ করে নাই, কোথাও তাহার লোভের চেহারা দেখা যায় নাই। আজিকার ঘটনাটা তাহাকে যেন বিপর্যাস্ত করিয়া তুলিল।

সে সুন্দরী এ-কথাটা পুরাতন। তাহার রূপ আছে ইহা আরো প্রচলিত। নিজের রূপ লইয়া সে কোথাও গর্ব্ব করে নাই, নিজেকে লইয়া সে কোনোদিন ভাবিতে বসিয়াছে এমনও তাহার মনে পড়ে না। কিন্তু আজ নিজেকে সে যেন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। মেয়েদের গুণ, বিদ্যা ও বুদ্ধির আদর যতটুকু আছে, তাহার চেয়ে অনেক বেশি করিয়া আছে তাহাদের রূপের আদর। রূপই বোধ করি মেয়েদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়; পুরুষের পৃথিবী নারীর রূপের পায়ের তলায় আজিও লুটাইতেছে।

নিজের ঘরে আসিয়া শিলি আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নানা রকম

আজগুবী কথা ভাবিতে লাগিল। আজ যেন হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আলোড়নে তাহার সমস্তটাই ওলোটপালট হইয়া গিয়াছে। ধাঁধাঁ লাগিয়াছে চোখে, আর কিছুই দেখা যায় না। যাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইবার সম্পূর্ণ সুযোগ তাহার ছিল, সেই ছেলেটাই যেন যাইবার সময় তাহার কাণ মলিয়া দিয়া গিয়াছে। তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কেমন একটা অদ্ভুত পরাজয় যেন তাহার ঘটিয়াছে, মুখে চোখে সেই পরাজয়ের গ্লানি মাখিয়া তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

একটা কথা তাহার কানে কেবল বাজিতেছিল, চমৎকার তুমি! এত রূপ! বাল্যকাল হইতে একথা তাহাকে অনেকে বলিয়াছে; তাহার রূপ, তাহার হাসি, তাহার দেহের গঠন,—কে না তাহার সুখ্যাতি করিয়াছে? কিন্তু কে জানিত, এই কথা দুইটির এত মূল্য! আজ যে ব্যক্তি তাহার রূপের প্রশংসা করিয়া গেল, সে ত' একজন পথের ফেরিওয়ালা, অজ্ঞাত কুলশীল একজন যুবক,—অসভ্য, অশিক্ষিত, অর্ব্বাচীন! পাণ খাইয়া সে জামাকাপড় নোংরা করে, বেহিসাবীর মতো কথা বলিয়া যায়, যুদ্ধের ঘোড়ার মতো বেপরোয়া চাল-চলনে ভদ্র মানুষকে সে বিরক্ত করিতে সাহস করে। তবু কেন যে থাকিয়া থাকিয়া শিলির মন মধুতে ভরিয়া উঠিতেছে কে জানে! তুমি চমৎকার, তোমাকে দেখিলে প্রাণের মূল পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকে।

সম্মুখে তাহার বিবাহ, আর কয়েকদিন পরেই পাকা দেখা, আচার-আয়োজন চলিতেছে, পাত্রটি সকলের প্রিয় ও পছন্দসই,—ইহাদের মাঝখানে থাকিয়া তাহার এ কি বিসদৃশ মনোবিকলন? তাহার মনের কথাটা জানিলে লোকে বলিবে কি? ইহাই ত অন্যায়, ইহারই নাম ত দুর্নীতি! হউক সে শিক্ষিত বি-এ পাশ করা মেয়ে, যতই স্বাধীনতার ভিতরে সে মানুষ হইয়া উঠুক না কেন, এই অসংযত মনোবিকারের রাশ সে টানিয়া ধরিবে, ইহাকে প্রশ্রয় দিয়া সে তাহার অকলঙ্ক কৌমার্য্যকে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ করিবে না।

পরদিন রমাপতি আবার আসিল। আশ্চর্য্য, তাহারই কথা ভাবিতে

ভাবিতে শিলি উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। অনেক রকম করিয়া নিজেকে সে তৈরী করিয়া রাখিয়াছিল। প্রয়োজন হইলে সামান্য কারণেই রমাপতিকে সকলের সম্মুখে অপমানজনক কথা বলিয়া দিবে,—কিন্তু তাহাকে আসিতে দেখিয়া শিলি দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিল, এবং নিজের হাতেই চেয়ারখানা টানিয়া দিয়া কহিল, বসুন। আজ ভালো জিনিস এনেছেন ?

রমাপতি কহিল, ভালো জিনিস ছাড়া আমি কারবার করিনে। তোমরা যদি চিনতে না পারো আমি কি করব ?

সত্যি বলছ ?—শিলি তাহাকে 'তুমি' বলিয়া ফেলিল। বয়সের পার্থক্য সামান্য, মাথায় দুইজনেই প্রায় সমান। 'তুমি' বলিলে অন্যায় হয় না।

রমাপতি হাসিল, গলা নামাইয়া কহিল, তোমার কাছে মিথ্যে বলবো না। আমার যা কিছু দেখেছ সব ভালো।

শিলি এবার রাগ করিল, কহিল, চুপি চুপি কথা বলছ কেন ?

কারণ, আমার কথা কেবল তোমারই জন্যে। আঃ কী সুন্দর তোমার চোখের রং! কী চোখের পাতা! যেন কালো ভ্রমর বসেছে নীলপদ্মের ওপর।—রমাপতি মুগ্ধ চক্ষে চাহিল।

চুপ করো তুমি।

রমাপতি হাসিয়া উঠিল। কহিল, আরো, আরো, কঠিন করো তোমার মুখ, আরো রাঙা হোক, চোখে আসুক বিদ্যুৎবহ্নি, তরঙ্গে তরঙ্গে নাচুক আমার বুকের রক্ত!

শিলি উত্তেজিত হইয়া বলিল, থামো, তোমার পাগলামি শুনতে চাইনে। জিনিস বার করো দেখি ?

করব না। বলিয়া রমাপতি মাথা দুলাইল। তাহার রুক্ষ রেশমী চুলের গোছা দুলিয়া উঠিল। সুন্দর চুল, সুন্দর ললাট।

বিস্মিত হইয়া শিলি চোখ কপালে তুলিল। বলিল, সে কি, কী জন্যে এসেছ ?

রমাপতি কহিল, যা দেখাবো তাই তোমার পক্ষে হবে বেমানান!

কেন ?

তুমি যে সুন্দর, তুমি যে আশ্চর্য্য ! কোন্ অলঙ্কার তোমাকে মানাবে, কোন্ মুক্তোয় তোমাকে করবে অপরূপ ?

শিলি তাহার দিকে চাহিল। দেখিল, লাবণ্যরসে টলোমলো তাহার মুখ, দুটি পাত্‌লা ঠোঁট, মসৃণ, চিক্কণ ; আয়ত দুই চোখে সুন্দরের দেবতার সোনার স্বপ্ন, চাঁপার কলির মতো আঙুল,—বাস্তবিকই রমাপতি অপরূপ !

সে কহিল, আজ তোমার হাতে আবার নতুন আংটি ? কালকের চেয়ে এটা আরো ভালো।

তোমার ভালো লাগছে ?

শিলি হাসিল। রমাপতি আংটিটা খুলিয়া তাহার কাছে ফেলিয়া দিল। মেঝের উপর সেটা গড়াইতে লাগিল।

ব্যস্ত হইয়া শিলি কহিল, করলে কি ? তোমার কি কোনো জিনিসে যত্ন নেই ?

না।

মায়াও নেই ?

একটুও না।

শিলি কৌতুক করিয়া কহিল, যে কোনো ভালো জিনিসকে তুমি অম্‌নি ক'রে ছুঁড়ে ফেল্‌তে পারো ?

রমাপতি হাসিয়া বলিল, কিছুতেই আমার মন নেই, খেয়ালের খেলা সব। তুলে নাও আংটিটা, শিলি ?

না, তুলবো না। ওটা তুমি ফেলে দিয়েছ, আমাকে দাওনি। ভিখিরীর মত আমি তুলে নেবো না।

রমাপতি কহিল, তবে হুকুম দাও, তুলে নিয়ে তোমার হাতে পরিয়ে দিই ?

আস্পর্দ্ধা !

তবে হুকুম দাও, আমার অঞ্জলী তোমার পায়ের কাছে রাখি ?

কিছুতেই না। শিলি মাথা দুলাইয়া বলিল।

রমাপতি হাসিয়া বলিল, দানও নেবে না, পূজোও গ্রহণ করবে না?

না, দুটোই তোমার খেয়াল। দুটোই ভয়ঙ্কর।

তবে বলো, কী দিয়ে তোমাকে আনন্দ দিতে পারি?

পায়েব শব্দ পাইয়া শিলির মুখের কথা থামিয়া গেল। রমাপতি তৎক্ষণাৎ তাহার পকেটের ভিতর হইতে নূতন জিনিষপত্র বাহির করিল।

ছোট পিসি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। কহিল, আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি তোকে, এই যে, কী এনেছ আজ? দাদাকে ডাক্‌ব?

রমাপতি কহিল, ডাকুন। আজকে আপনাদের পছন্দ না হ'লে বুঝবো, আপনাবা পছন্দ কবতেই জানেন না।

ইহার মাত্রাজ্ঞানহীন উক্তির কথা ছোট পিসি ভুলিতে পারে নাই, আজ সে সজাগ ছিল। তীব্রকণ্ঠে কহিল, তোমার মুখ দেখে ত' আমাদের জিনিস পছন্দ হবে না, আমরা সব দেখে শুনে নেবো। ভারি পাকা পাকা কথা, কত বযস তোমার?

বমাপতি কহিল, তেইশ।

বিয়ে করেছ?

মণিমুক্তোর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

ছোট পিসির শাসন ভাসিয়া গেল! সে হাসিয়া উঠিল। কহিল, কেন, দেশে মেয়ে নেই?

রমাপতি কহিল, না।

কেমন ক'রেই বা থাকবে! অত পাণ খাও, লক্ষ্মীছাড়ার মতন চেহারা, তোমাকে মেয়ে দেবে কে?

আংটিটা মেঝের উপর পড়িয়া এমনই জ্বল জ্বল করিতেছিল যে, শিলি একটু একটু পিছনে হাঁটিয়া সেটা পা দিয়া চাপিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কী যে বলিবে তাহা সে বুঝিতে পারিল না, তাহার মাথার মধ্যে

গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে। রমাপতি অলক্ষ্যে সেইদিকে তাকাইয়া কৌতুক বোধ করিতেছিল।

ছোট পিসি কহিল, কথার উত্তর দাও না যে?

আঃ—রামপতি হঠাৎ বিরক্ত হইল। হাসিয়া কহিল, তুমি দেবে তোমার মেয়ে, তুমি আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ!

ছোট পিসি আজ আর লজ্জিত হইল না। বলিল, আমি মেয়ে কোথা পাবো, বিধবা মানুষ। থাকলেও তোমার মতন উড়নচুড়ে ছেলের হাতে দিতুম না।

না, দিতে না। গন্ধর্ব্বকে ভয় ক'রো, তারা চুপি চুপি রাতের বেলা উড়িয়ে নিয়ে যায়। যাও, যাও, আনো ডেকে কর্ত্তা মশাইকে। বড় জ্বালাতন করো তোমরা।

আগে আমাদের দেখাও কী এনেছ। আয় শিলি, দেখবি আয় ত?

রমাপতি কহিল, না, দেখাবো না তোমাদের। তোমরা মেয়েছেলে, আসল-নকল চিনতে তোমরা কোনো জন্মেই পারো না।

ছোট পিসি তীব্রকণ্ঠে কহিল, খুব পারি। এই তুমি, তোমার মতন পাজি ছেলে কল্‌কাতায় নেই! পারিনে চিন্‌তে?

বা রে,—রমাপতি হাসিয়া বলিল, মুখে করছ নিন্দে, মনে করছ সুখ্যাতি। তোমাকে চিনি গো চিনি, মেয়ে থাকলে তুমিই আগে আমাকে জামাই করতে। ওই যা, আজ পানের কৌটো আন্‌তে ভুলে গেছি! কী হবে?

পান দেবো না তোমাকে।

ওই ছ্যাখো, না চাইতেই পান দিতে চাও।—রমাপতি হাসিমুখে কহিল, পান দেবার জন্যে মন তোমার উৎসুক। না দিতে পারলে আজ রাতে তোমার ঘুম হবে না।

শিলি চেঁচাইয়া উঠিল। বলিল, মুখ সাম্‌লে তুমি কথা ব'লো। ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে—

রমাপতি নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল, ওই নাও! দেবতারাও জানেন না

তোমাদের! দু'জনের মধ্যে গভীর বিদ্বেষ! একজনকে একটু প্রশ্রয় দিলে আর একজন রাগ করে।

শিলি কহিল, তুমি অত্যন্ত ইতর।

ওই নাও, মনে মনে আবার আমাকে ভদ্র ক'রে তোলবার চেষ্টা।—রমাপতি হাসিয়া বলিল, আর পারিনে তোমাদের নিয়ে। এ বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায় ছাখ্।

ছোট পিসি উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, দাদাকে ডেকে আনি, তোমার পেজোমি বা'র করছি।

রমাপতি কহিল, অম্‌নি পাণ এনো শাশুড়ী ঠাকরুণ, যদি না আনো তবে পরের জন্মেও বিধবা হবে।

ছোট পিসি চলিয়া গেল।

আংটিটা তুলিয়া টেব্‌লের উপর রাখিয়া শিলি কহিল, জিনিস বেচতে এসেছ, ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গে কথা বল্‌তে শেখোনি?

না।

তোমার আংটিতে আমি লাথি মারি।

আচ্ছা, এবার তোমাকেই পাণ আন্‌তে অনুরোধ করব, তা হলে হবে ত? যেন সতীনের আড়ি!

ছাই তুলে দেবো তোমার মুখে। বদ্‌মায়েসী করবার আর বুঝি জায়গা পাওনি?

না। কিন্তু কী সুন্দর তোমার রাগ!

শিলি কহিল, কত মেয়ের কাছে এমন কথা বলেছ?

কী সুন্দর তোমার বিদ্রূপ!

লজ্জা করে না মেয়েমানুষের আঁস্তাকুড়ে ঘুরতে?

রমাপতি তাহার দিকে চাহিয়া মধুর হাসি হাসিতে লাগিল। চক্ষু যেন তাহার শিবনেত্র, আয়ত দীর্ঘ! অপূর্ব্ব তাহার সংযুক্ত ভ্রূরেখার ভঙ্গী। বলবান বক্ষঃস্থল, পেশীবহুল বলিষ্ঠ দুই হাত,—এমন শ্রী দেবতাতেও দুর্লভ!

শিলি তাহার দিকে চোখ রাখিতে পারিল না। মুখ ফিরাইয়া কম্পিতকণ্ঠে পুনরায়কহিল, অসচ্চরিত্র !

রমাপতি কহিল, এ কি করেছ তুমি? আংটিটা যে বেঁকে গেল তোমার পায়ের চাপে?

শিলি একটু অপ্রস্তুত হইল। কহিল, তুমি আমাকে দিয়েছিলে কেন?

রমাপতি কৃত্রিম অভিনয় করিয়া কহিল, আমি ত' দেখবার জন্যে দিয়েছিলুম তোমার হাতে? তাই ব'লে তুমি নষ্ট করবে? কত দাম জানো? আড়াই হাজার। আমি কিছু শুনতে চাইনে, তোমার বাবাকে বল্‌ব।

শিলি ভয় পাইয়া বলিল, কী বলবে তুমি?

বল্‌ব আপনার মেয়ে আমার এই লোকসান করেছে, আপনি যদি ক্ষতি-পূরণ না দেন্ তবে এখুনি পুলিশ ডাক্‌বো।

শিলি ঢোক গিলিল। বলিল, আমার কী অপরাধ?

রমাপতি কহিল, সে কথা পুলিশ বিচার কববে। জানো আমার মামা কলকাতার এই ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার?

ভয়ে শিলির পা কাঁপিতে লাগিল, তাহার গলা শুকাইয়া উঠিল। এই ভয়ঙ্কর, এই সর্ব্বনাশা ছেলে তাহাকে যে এমন বিপদে ফেলিবে এ কথা কে জানিত? বাবার কাছে যে একে একে তাহার লজ্জা প্রকাশ হইয়া পড়িবে! লোকে কী বলিবে? এ কলঙ্ক কেমন করিয়া ঢাকিবে?

রমাপতি কহিল, জানো আমি ব্যবসাদার, একটি পয়সাও ছাড়তে পারব না? তা ছাড়া আজকের আর কালকের সব ইতিহাস আমি ব'লে দেবো। তোমার বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। পাত্রপক্ষের কাছে তোমার কলঙ্কের সব কথা জানাবো। লোকে তোমাদের ছি ছি করবে, অসচ্চরিত্র বলবে।

শিলি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া আসিল। তাহার স্বাতন্ত্র্য, তাহার শিক্ষা-দীক্ষা, তাহার স্বাধীন মন সমস্তই যেন ভাসিয়া গেল। এই নির্ব্বোধ অশিক্ষিত ও ছোক্‌রা ব্যবসাদার যেন তাহার সকল

সম্ভ্রম নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আসিয়াছে। অশ্রুজড়িত কণ্ঠে সে কহিল, আমায় ক্ষমা করো তুমি, বাবার কাছে কিছু ব'লো না!

ক্ষমা! আড়াই হাজার টাকা দামের আংটি! ক্ষমা এতই সস্তা! চোখের জলে যদিও তোমাকে খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে, কিন্তু সে আমি পারব না। অলঙ্কার বিক্রি ক'রে আমাদের পেট চলে, তোমার সুন্দর মুখ আর চোখের জলে ত' আমাদের ক্ষতিপূরণ হবে না. শিলি! এই নাও, রেখে দাও আংটি, কোনো কথা শুনতে চাইনে। কাল পর্য্যন্ত সময় রইল, আড়াইটি হাজার টাকা আমার দোকানে কাল জমা দিয়ে এসো। নৈলে পুলিশে গিয়ে আমরা—

বাহিরে চটি জুতার শব্দ হইল।

রমাপতি কহিল, অবশ্য তোমার বাবাকে সব কথাই ব'লে যাচ্ছি—

শিলি হঠাৎ দুই হাত জোড় করিয়া আকুলকণ্ঠে কহিল, তোমার পায়ে পড়ি রমাপতি—

সাবধান, আমাকে ছুঁলে আরো কলঙ্ক হবে। তুলে নাও আংটি বল্‌ছি, নৈলে ভালো হবে না। পায় ধ'রে এখন কান্নাকাটি করতে এসেছ, কেমন? বেরিয়ে যাও ঘর থেকে, চোখের জল মুছে এসো।

অনুগত দাসীর মতো শিলি আংটিটা লইয়া অন্য দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

এই যে আসুন, 'সেই কখন্ থেকে ব'সে আছি, কারো ছায়া নেই।

বঙ্কিমবাবু আসিয়া বসিলেন। ছোট পিসি পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে চোখে হাসি ও কৌতুক। বুঝা গেল, সব কথা সে চাপিয়া গিয়াছে। রমাপতি নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার জিনিসপত্র বাহির করিল।

ওই যে, পাণ এনেছেন হাতে, দিন্, দিন্। বলিয়া সে একসময়ে হাত বাড়াইল।

ছোট পিসি পাণ আনিয়াছিল কিন্তু চাহিবার আগেই হাতে তুলিয়া দিবার

সাহস তাহার হইতেছিল না ; হয়ত দাদা কিছু মনে করিতে পারেন। এইবার সে পাণ দিল, রমাপতি চোখ বুজিয়া দুই তিনটা পাণ মুখে পুরিয়া লইল।

নতুন মুক্তার মালা, বিচিত্র টায়রা, হীরা-বসানো ব্রেসলেট, নীলার আংটি, প্রবালের দুল, বঙ্কিমবাবু সমস্তগুলি লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এক সময়ে বলিলেন, শিলি কই ?

শিলি দরজার পাশেই ছিল, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বঙ্কিমবাবু হাসিয়া বলিলেন, সবগুলোই নিতে হয়, না মা ? এগুলো পছন্দ হয় ত ?

শিলি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাহার পছন্দ !

রমাপতি হাসিল। বলিল, হতেই হবে, যে সে জিনিস নয়, পছন্দ না হ'য়ে যাবে কোথায় ?

খাঁটি ত ?

দেখে নিন্ ভালো ক'রে। নকল জিনিসের ফিরি আমরা করিনে, মশাই। মেয়েদের দেখিয়ে আসুন, যদি ফাঁকি থাকে তাদের চোখে ধরা প'ড়ে যাবে ! —রমাপতি তাহার আগেকার মতের উল্‌টা মতটা হঠাৎ ব্যক্ত করিয়া শিলিকে বিস্মিত করিল।

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, মালাটার দাম কত ?

সাত শো।

আর এই আংটিটার ?

দেখুন, আংটির সম্বন্ধে আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

ভয়ে শিলির বুকের রক্ত শুকাইয়া উঠিল, তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিল। বিবর্ণ মুখে সে চাহিল।

রমাপতি কহিল, একটু আড়ালে আপনাকে বল্‌ব।

শিলি উত্তেজিত হইয়া বলিল, না, সামনেই বলো। আমি থাকব এখানে।

বঙ্কিমবাবু একটু অবাক হইয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, ও যদি একটু আড়ালেই বল্‌তে চায় মা ?

না বাবা, সামনেই বলুক। কী দোষ করেছি আমরা ?

রমাপতি কহিল, যান্ না আড়ালে, বাবার অবাধ্য হচ্ছেন কেন ?

পিতার মুখের দিকে নিরুপায় ও বিবর্ণ মুখে চাহিয়া শিলি ছোট পিসির সহিত বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। রমাপতি বাবার নিকট কি-যে বলিবে, তাহাই ভাবিয়া পুনরায় তাহার কান্না পাইতে লাগিল।

পিছনের দরজার দিকে একবার তাকাইয়া লইয়া রমাপতি কহিল, এই নীলার আংটিটা আপনি নিন্, কিছু সস্তায় দিতে পারবো।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, সস্তায় দিতে চাও কেন ?

আপনি এর দাম কত মনে করেন ? এর আসল দাম আটশো টাকা। আপনাকে তিনশোয় ছেড়ে দিতে পারি।

কেন ? এ যে বড় সন্দেহজনক !

রমাপতি কহিল, দেখুন, সত্যিই বল্‌ছি, নীলা আমাদের দোকান থেকে বিক্রি হতে চায় না। ওটা যেন কেমন অপয়া ! একজন এটা অর্ডার দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি নিতে পারেননি। আপনি যেন দয়া ক'রে কাউকে বল্‌বেন না যে, এত সস্তায় আপনি পেয়েছেন।

তোমার কথায় অবশ্য বিশ্বাস করাই উচিৎ, কিন্তু ধারো যদি—

তবে আপনি যাচিয়ে নিন্ জহুরী এনে। কেন বল্‌ব মিথ্যে ? টাকায় আমাদের লোভ কম, আমাদের কোম্পানী অনেক বড়। রত্নিপতি রায় কোম্পানীর দোকান ঝাঁট্ দিলে অমন দশ বিশটে আংটি জঞ্জাল থেকে বেরোয়।—রমাপতি কহিল, ভারি ঝামেলা দেখছি ! মাত্র হাজার তিনেক টাকার মাল বেচ্‌তে এসে একেবারে হিমসিম খেয়ে গেলাম। নেবেন ত নিন্।

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, ব্রেসলেট কি হাজার টাকার কমে দেবে না ?

কানা কড়িও না।

তাহ'লে ব্রেসলেট্, আংটী, মালা আর টায়রা—কেমন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, দু' হাজার ছ'শো পঁচিশ টাকা বে'র ক'রে দিন।—আহা, পাণের মধ্যে কী ?

বঙ্কিমবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, কেন কিছু চিবিয়েছ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বালি। বালি আর কাদা আগাগোড়া। আমাকে জব্দ ক'রে দিয়েছে !

তিনি হাঁক দিয়া ডাকিলেন। শিলি ও ছোটপিসি আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, পাণে এত বালি কাঁকর কেন ?

ছোট পিসি কহিল, বালি ? সে কি ?

যাও, মুখ ধোবার জল পাঠিয়ে দাও। আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করো তুমি, শিলিব ঠাকুমাকে এগুলো দেখিয়ে আনি।—বলিয়া বঙ্কিমবাবু উঠিয়া গেলেন। শিলি তাঁহার সঙ্গে গেল। এখানে আর একা থাকিতে তাহার সাহস নাই। আংটিটা সে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরিয়া ছিল। কিন্তু যাইতে যাইতে সে ভাবিল, পাণের মধ্যে অত বালি আর কাঁকব আসিল কোথা হইতে। ছোট পিসি যেন কী হইয়াছে আজকাল।

ছোট পিসি জল লইয়া আসিল। হাসিয়া কহিল, কেমন জব্দ ? ওই তোমার শাস্তি !

রমাপতি কহিল, কোন্ শালী পাণ সেজেছে বলো ত ?

পাণ ছোটপিসির নিজের হাতেই সাজা। তাহার মুখের চেহারা হঠাৎ রক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু লজ্জা ত্যাগ করিয়া কহিল, ছি ছি, ভদ্র ভাষা বলতে শেখোনি ? ঝিয়ের হাতের পাণ তোমাকে দেবো কেন, আমি নিজেই ত সেজে এনেছি।

তাই নাকি ?—রমাপতি হাসিয়া কহিল, শাশুড়ীকে শালী ব'লে গাল দিলুম ?

নাক খৎ দাও।

না, পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাইবো।

ছুঁতে দেবো তোমাকে ? কিল বসিয়ে দেবো পিঠে। কই, মুখ ধুলে না যে।

রমাপতি জলের গেলাস লইয়া মুখে ধরিল এবং সমস্ত জলটাই এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল।

ছোট পিসি কহিল, ওর নাম মুখ ধোয়া ? বালি-কাঁকব পেটে গেল যে ? ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমার।

রমাপতি কহিল, জামাই আদর করেছ, যা দিলে সবই খেয়ে ফেললুম।

দাদা কি বুঝতে পেরেছেন ?

বুঝিয়ে দিলেই পারতুম। তোমাদের মনের চেহারাটা তিনি জানতে পারতেন। বলিয়া রমাপতি হাসিল।

ছোট পিসি ভয় পাইয়া কহিল, বলো না যেন লক্ষ্মীটি '

ঠিক সময়েই বল্‌ব। তুমি জব্দ হবে। বাইরের একটা ছেলে ভেতরে এলে তোমরা বুঝি এম্‌নি হাসি-তামাসা করো ? এই বুঝি তোমাদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের রীতি ?

ছোট পিসি তাহার গম্ভীব মুখ দেখিযা সহসা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। বিবর্ণ মুখে কহিল, এমন কাজ আর করব না, তুমি ক্ষমা করো। আমি বিধবা মানুষ, লোকে বল্‌বে কি ? - তাহাব ব্যাকুল চোখে সহসা অশ্রু আসিতে চাহিল।

ঘরে কেহ নাই। বমাপতি চতুর্দিকে তাকাইয়া কহিল, আগে বলো আমি যা বল্‌ব তাই শুন্‌বে ?

ছোট পিসি এদিক-ওদিক তাকাইযা ভগ্নকণ্ঠে কহিল, শুন্‌বো।

একটুও আপত্তি করবে না ?

না।

কাউকে বলবে না ?

না।

রমাপতি কহিল, বেশ, তবে কাছে এসো।

ছোট পিসি সরিয়া আসিল। রমাপতি একগাছা মুক্তার মালা লইযা সযত্নে তাহার গলায় পরাইয়া দিল। তাবপর পরম স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে নিতান্ত নিকটাত্মীয়ের মতো কহিল, কোনো দোষ তুমি করোনি ! দোষ তাদের যারা তোমাকে বিধবার সজ্জায় সাজিয়ে রেখেছে। তোমার স্বভাব-ধর্ম্মকে যারা মেরেছে !

ছোট পিসির হৃদয় যেন হঠাৎ চূরমার হইয়া পড়িল। করুণকণ্ঠে কহিল, এমন সুন্দর তুমি তা জানতুম না!

রমাপতি তাহার দুইটি হাত ধরিয়া কহিল, কোনো লোভ নেই তোমার ওপর, আমি মালাটা দিলুম তোমার প্রতি সম্মানের চিহ্ন। ওইটি তোমার গোপন সান্ত্বনার সম্পদ, আমাকে মাঝে মাঝে স্মরণ ক'রো।

ছোট পিসি বলিল, আমার স্বামীর ছবি আছে আমার ঘরে, রমাপতি।

বেশ ত, সেই ছবির ফ্রেমে ঝুলিয়ে দিও ওই মালা। মনে ক'রো বন্ধুর দান!

পায়ের শব্দ পাইয়া পাশের দরজা দিয়া ছোটপিসি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার চোখে অশ্রু জমিতেছিল।

বঙ্কিমবাবু আসিলেন, তাহার সঙ্গে শিলি আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। রমাপতি জিজ্ঞাসা করিল, পছন্দ হয়েছে?

হ্যাঁ, হয়েছে। এগুলো তবে রেখে যাও! টাকা কী ভাবে দেবো, নগদ টাকা ত হাতে নেই?

রমাপতি স্পষ্ট করিয়া কহিল, কিন্তু ধারে কারবার আমরা ত' করিনে!

শিলি কহিল, আমরাও করিনে। আপনি ওকে চেক্ লিখে দিন্ বাবা। আমি চেক্ বই আনি।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, আমার পকেটেই আছে মা।

বঙ্কিমবাবু চেক্ লিখিয়া দিলেন। বলিলেন, আবার দরকার হ'লে ডাকবো, মনে রেখো, বাবা!

রমাপতি কহিল, স্নেহ রাখবেন আমার প্রতি। মাঝে মাঝে আমার জলতেষ্টা পায়, চাইকি আপনার এখানে এক আধবার উঁকি মারতে পারি।—বলিয়া সে অলক্ষ্যে একবার শিলির দিকে চাহিয়া লইল।

বেশ ছে'লে তুমি।—বলিয়া বঙ্কিমবাবু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শিলি গম্ভীরভাবে অন্দরমহলের দিকে অগ্রসর হইল।

তিনি ঘর হইতে বাহির হইবার পর শিলি দ্রুতপদে আসিয়া কহিল, কী বলেছ তুমি বাবাকে ?

রমাপতি কহিল, বললুম যা বলবার। কিছু ত আর বাকি রাখোনি—সবই প্রকাশ করলুম! তিনি বললেন, এই দুর্নীতির প্রতিবিধান করবেন।

এই নাও তোমার আংটি—

ওটা তোমার বাবার কাছে রাখতে দিয়ো। তিনি তোমার গুণের কথা জেনেছেন।—বলিয়া রমাপতি অগ্রসর হইল।

শিলি কহিল, পুলিশে গিয়ে তুমি সব বল্‌বে ?

নিশ্চয়ই, আমি এখুনি ডায়েরী করব।

তুমি চোর, তুমি লম্পট, তুমি—

তাহার বিদীর্ণ কণ্ঠ শুনিয়া রমাপতি হাসিল। কিন্তু তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া সহসা সংযত ভাবে শিলি কাছে সরিয়া আসিল। আপন উত্তেজনাকে সংযত করিয়া সে রমাপতির একটা হাত ধরিল! অশ্রুজড়িত কণ্ঠে কহিল, আমাকে বিপদে ফেলো না তুমি।

রমাপতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল। দুইটি সুন্দর চোখ—দুইটি অপরূপ চোখের ভিতরে তাকাইয়া কী যেন খুঁজিতে লাগিল। রমাপতির মসৃণ উজ্জ্বল মুখখানা লাবণ্য-রসে টসটস করিতেছে, কোথাও খুঁৎ নাই, কোথাও প্রণয়-অভিজ্ঞতার লেশমাত্র দাগ পড়ে নাই। যেমন সুন্দর, তেমন করুণ, তেমন মধুর। শিলির হাওয়ায় কেমন একটি মিষ্ট গন্ধ, শুচিসুন্দর কৌমার্য্যের অপরূপ কমনীয়তা, অপূর্ব্ব লালিত্য! দেখিলেই মনে হয়, পুরুষ তাহাকে কোনোদিন স্পর্শ করে নাই। তাহার দেহ ও পরিচ্ছদে কেমন যেন অদ্ভুত মাদক-মদির সৌরভ, একটা স্বপ্নাবেশের নেশা। তাহার ভয়ের সঙ্গে জড়ানো প্রণয়ের আভাস,—তাহার দম্ভের সঙ্গে নিরুপায় আত্মসমর্পণ যেন একটি বিচিত্র শ্রী মিলাইয়া দিয়াছে। রামপতি তাহার সর্ব্বশরীরের উপর চোখ বুলাইয়া যখন নিবিড় তৃপ্তিতে দেখিতে লাগিল, শিলি তখন নিজেকে সম্বরণ

করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে ভুলিয়া গেল। ফুল যেন ভ্রমরের দিকে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে।

মৃদুকণ্ঠে শিলি কহিল, তুমি যা বল্‌বে আমি তাই শুনবো।

ঠিক শুনবে ত? বাধা দেবে না?

না। তোমার যেকোন হুকুম মান্‌বো।—শিলির গা কাঁপিতেছিল, পা কাঁপিতেছিল। সে রমাপতির দুইটা হাত নিজের হাতের মধ্যে জড়াইয়া বলিল, তুমি এত সুন্দর, কিন্তু এত ভয়ঙ্কর কেন? তুমি জহুরী, না শিল্পী, কে তুমি? নিজের রূপ দিয়ে কেন তুমি এমন আগুন জ্বালাও?

আমি বড দরিদ্র শিলি!

দরিদ্র হয়েও তুমি বড়, তুমি মহাদেব! তুমি একদিকে ভোলানাথ, অন্যদিকে প্রলয়ঙ্কর। আমাকে তুমি এমন করে ধ্বংস ক'রো না!—শিলি পুনরায় কাঁদিয়া ফেলিল।

রমাপতি কি-যেন বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তাহার মোটর অপেক্ষা করিতেছিল।

বাহিরে রাত্রি থম্‌থম করিতেছে। বারোটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই। নিজের ঘরে ঢুকিয়া ছোটপিসি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর সুইচ্‌ টিপিয়া আলো জ্বালিল।

কেমন একটা বিস্ময়কর অস্বস্তি! খানিকটা আনন্দের সঙ্গে বাকিটা যেন ধিক্কার। মাধুর্যের সঙ্গে মিশানো দুর্নীতি। ভয়ের সঙ্গে ব্যর্থতার বেদনা।

ছোট পিসি কাহাকেও জানিতে দিল না, নিজের আচরণকে যেন সে নিজের বিবেকের নিকট লুকাইতে লাগিল। মাথা তুলিতে পারিল না, মাথাও হেঁট করিল না, অথচ নিজের মুখের চেহারাটা কিছু পরিমাণে অস্বস্তিকর বোধ হইতেছে।

ক্যাশবাক্সের ভিতর হইতে মুক্তার মালাটা সে বাহির করিল। হাত কাঁপিতেছে, বুক কাঁপিতেছে! যেন এই সুন্দর মুক্তার ভিতর দিয়া রমাপতি হাসিয়া বলিতেছে, তোমার প্রতি আমার লোভ নাই, কিন্তু বিধবা হইয়া এ তুমি কী করিতেছ? কেন তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে আমার বয়স? কেন জানিতে চাহিয়াছিলে আমার বিবাহ হইয়াছে কি না? পাণের মধ্যে বালি আর কাঁকর মিশাইয়া কেন করিয়াছিলে তামাসা? মনের মধ্যে কোন্ ক্ষুধা জমা আছে?

ছোটপিসি দিব্য দৃষ্টিতে নিজের চেহারাটা দেখিতে লাগিল। রমাপতির নিকট তাহার বারম্বার যাতায়াত, নানা অছিলায় কথপোকথনকে দীর্ঘ করিয়া তোলা, অকারণ কৌতুহল, রমাপতির দোষস্খালনের চেষ্টা, তাহার রূপের প্রশংসা, দাদাকে দিয়া তাহাকে শাসন করিতে ভুলিয়া যাওয়া,—সমস্তটা মিলাইলে কী অর্থ দাঁড়ায়?

মুক্তার মালা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নিজের হাতে পাণ সাজিয়াছিলে কেন? নাকখৎ দেওয়াইয়া কেন খুশি হইতে চাহিয়াছিলে? পায়ে হাত দিয়া ক্ষমা চাহিলে তুমি কি আনন্দিত হইয়া কিল বসাইতে না তাহার পিঠে? তুমি নিশ্চয় তরুণের স্পর্শ চাও, তোমার সংযম ও বিবেচনার পিছনে রহিয়াছে রূপবান পুরুষের প্রতি লোভ! তারপর পরিশেষে?—কাছে গিয়া তাহার হাতে মালা পরিয়াছিলে না? রক্তে কি তোমার দোলা লাগে নাই? সুন্দর বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলে কেন? ওগো হিন্দুঘরের চরিত্রবতী বিধবা, কৃতজ্ঞ থাকো রমাপতির কাছে, সে তোমার চরিত্র ও সুনামকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছে! সুযোগ ও সুবিধা পাইলে তোমার মতো বহু বিধবা প্রণয়-প্রশ্রয়িণী হইয়া উঠিত ইহাতে আর সন্দেহ নাই!

মুখ তুলিয়া ছোটপিসি দেখিল, দেয়ালে টাঙানো স্বামীর ফটো। মাত্র ছয় মাসের জন্য পরিচয়, তাহার পরেই নিউমোনিয়ায় তরুণ যুবকটির অপ্রত্যাশিত অকালমৃত্যু ঘটে। নয় বৎসর ধরিয়া সেই ছয় মাসের স্মৃতি বহন করিতে হইতেছে, চিরজীবনই করিতে হইবে। স্বামীর স্মৃতি পবিত্র সন্দেহ

নাই, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রহিয়াছে তেমনই অকৃত্রিম কিন্তু আজ নারীর প্রকৃতি যদি বৈধব্যের বন্ধন ডিঙাইয়া জাগিয়া উঠিতে চায় তবে দোষ কাহার ? কোন্ পথ দিয়া সংযমকে ধরিতে হয়, কোথা দিয়া আসে নীতিবোধ—তাহা সে জানে না। প্রণয় নিরোধ করিয়া থাকাটাই কি বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ?

ছবির তলায় মাথা রাখিয়া ছোটপিসি কাঁদিল। কাহাকে জানাইবে তাহার এই দ্বন্দ্ব ? সুস্থ মন ও সবল দেহের স্বভাবের ভিতরে যে থাকে বাসনা আর আসক্তি, যে সতেজ প্রাণময়তা, যে প্রণয়-লোলুপতা ও সন্তানের ক্ষুধা, –তাহা কি কেবল লোকরুচির অনুসাশনেই মনের মধ্যে বিলীন হইতে চায় ? নীতি ও দুর্নীতির অতীত কি কোনো সত্য নাই ?

মুক্তার মালাটা যেন তাহার প্রচলিত জীবনযাত্রায় একটা নিদারুণ বিপ্লব বাধাইয়া দিল। ভালো, মন্দ, সত্য-মিথ্যা, বৈধব্য-ব্রহ্মচর্য্য সমস্তগুলোকে পদ-দলিত করিয়া চুরমার করিয়া সব যেন একাকার করিয়া দিল। কেমন একটা নিদ্রিত চেতনা তাহাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া সংসারের সকল সংস্কার হইতে বাহিরে টানিয়া লইয়া এক মহাসমুদ্রের তীরে ছাড়িয়া দিল। কোনো পথ তাহার জানা নাই, কোন্ পথে সে যাইবে ?

ফটোখানা খুলিয়া সে দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, তারপর বিছানায় শুইয়া ছবিখানাকেই সে বুকের কাছে রাখিল। মুক্তার মালাটাকে সে অশ্রদ্ধা করিতে পারিল না ; ইহা বন্ধুর দান, মূল্যবান সম্পদ। বেড্-সুইচ্ টিপিয়া আলোটা সে নিবাইয়া দিল, তারপর অন্ধকারে সযত্নে মলাটা গলায় পরিয়া ফটোখানা দুই হাতের মধ্যে লইয়া সে চোখ বুজিল। তাহার ন্যায় ও অন্যায়ের জন্য তিনিই দায়ী, যিনি সকল মানুষের অন্তর্যামী !

লালবাজারের এক দোকানের ধারে আসিয়া শিলি ট্যাক্সি হইতে নামিল। সম্মুখে রতিপতি রায় এণ্ড কোম্পানী। ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সে দোকানে উঠিল। খরিদ্দার আসিয়াছে মনে করিয়া দোকানের জন-জটলার ভিতর

হইতে একটি লোক আসিয়া বলিল, আসুন, ওই দিকে আমাদের শো-কেশ আছে।

শিলি কহিল, থাক্, আমি চাই রমাপতিবাবুকে।

এই যে তিনি।

বলিতে বলিতেই রমাপতি আসিয়া দাঁড়াইল। কর্ম্মচারিটি চলিয়া গেল। শিলি দেখিল, রমাপতির নতুন পোষাক। সাহেবের মতো সাজসজ্জা, কোথাও খুঁৎ নাই। শিলি মুহূর্ত্তে তাহার দিকে চোখ বুলাইয়া সাগ্রহে কহিল, নালিশ করেছ?

রমাপতি হাসিয়া কহিল, নালিশ! কা'র নামে, কিসের জন্তে!

হাতের মুঠোর মধ্যে আংটিটা ছিল, শিলি তাহা দেখাইয়া কহিল, এর জন্যে?

ওঃ—এসো তুমি এদিকে। শো-কেশের দিকে যাই, এদিকে বড় ভিড়।

দেকানটা বড়। নানা ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যে চোখ যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়ে। সোনা, রূপা, প্লাটিনম্, হীরা, মণি, মুক্তা,—যেন রাজার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে। অপেক্ষাকৃত একটু নির্জ্জন স্থানে গিয়া রমাপতি কহিল, লাল শাড়ী কে পরালো তোমাকে, কোন্ শিল্পী? তুমি কি দেবী? অপ্সরী?

শিলি কহিল, নালিশ কি সত্যিই করবে?

সে এক সময় করলেই চলবে, আগে তোমাকে দেখি। কপাল ঝরা চুলের গোছা, যেন আমারই প্রাণের চেতনা। যে পথ দিয়ে এলে তুমি, সেখানে কি এখনো ফুল ফুটে ওঠেনি?

আংটিটা তবে ফিরিয়ে নাও?

রমাপতি হাসিয়া উঠিল। কহিল, দেবি, সবই যে মিথ্যে!

কী মিথ্যে?

কে নালিশ করবে কা'র বিরুদ্ধে? তুচ্ছ আংটি, তোমার পায়ের তলায় হৃদয়কে ঢেলে দিলেও যে আনন্দ! তোমার উদ্বেগের মধ্যে যে অসীম সৌন্দর্য্য দেখতে পেলুম, আমি কি সেই লোভ ছাড়তে পারি?

শিলির মুখে দেখিতে দেখিতে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, এবার তবে আংটি ফিরিয়ে নাও?—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বাঁচিল।

রমাপতি বলিল, তার বদলে তুমি কি চাও বলো?

শিলির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। মাথা হেঁট করিয়া কহিল, যা চাইবো তাই ত তোমার কাছে সামান্য। এমন জিনিস নেই যা দিলে তুমি সর্ব্বস্বান্ত হও?

রমাপতি অনেকক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর বলিল, কই, আমি ত কিছু ভেবে পাইনে!

শিলি কহিল, দেবার অহঙ্কার তোমার আছে, তাই ত' তোমার দানে মন খুশি হয় না।

সব মণিমুক্তো তোমায় দিযে দিতে পারি, শিলি।

সহজে দিতে পারো বলেই ত' ওগুলো এত সস্তা। যাই, এবার আমি উঠি। অনেক কাজ।

রমাপতি কহিল, না। দাঁড়াও। বসো এইখানে, অনেক কথা আছে।

আ টিটা নিয়ে যাও?—বলিয়া শিলি হাত বাড়াইল।

ফেলে দাও ঐ শো-কেসের মধ্যে।—রমাপতি জরুরী কাজে চলিযা গেল। শিলি মুখ ফিরাইয়া দেখিল, একজন কর্ম্মচারীর নিকট একটি মেয়ে প্রঃ করিতেছে, রমাপতি নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেই নমস্কার বিনিময করিল। তারপর দুইজনেই দূরে চলিয়া গেল, রমাপতি তাহাকে লইযা নানা অলঙ্কার দেখাইতে লাগিল। সম্ভবতঃ নতুন খরিদ্দার।

আধঘণ্টারও বেশি দেরী হইল। সকল কাজ ফুরাইয়াছে, বসিযা থাকিবার আর কোনো হেতুও নাই, তবুও শিলির পা উঠিল না, উন্মুখ হইযা সে অপেক্ষা করিতে লাগিল, তাহার চলিযা যাইবার উপায ছিল না। একটা ভয়ানক নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। 'অনেক কথা' তাহার না শুনিলেই চলিবে না। অথচ কোনো কথাই আর বাকি নাই ইহা সে জানে, যে বিপদে সে পড়িয়াছিল তাহা হইতেও সে মুক্তি পাইয়াছে,—ইহার পরে আবার কোন্

কথা? শিলি বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, ছে'লেরা কি এইরূপ? এমনি বেপরোয়া, এমনি সুন্দর, এমনি আগোছালো? ছেলে সে অনেক দেখিয়াছে কিন্তু তাহারা আত্মীয়-স্বজন, অতি-ঘনিষ্ঠতার পরিচয়ের মধ্যে তাহারা বৈচিত্র্যহীন, কিন্তু অনাত্মীয় পুরুষ আসে অনন্ত বৈচিত্র্য লইয়া, তাহাদের ভিতর দিয়া অনাবিষ্কৃত এক দুর্লভ জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। এই রমাপতি কি তাহাদেরই একজন? সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে কেমন অপরূপ সাবল্য, ইহার কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তৃতার ভিতরে ইহারই দুরন্ত প্রাণের অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য, ইহার বলবান পৌরুষ, বাধাবন্ধনহীন মন, রূপ ও সৌন্দর্য্যের প্রতি নিবিড় অনুরাগ, লোকরুচি ও সংস্কার হইতে উত্তীর্ণ ইহার সকল আচরণ,—এমন পুরুষ দুর্লভ।

শিলিব মনে কেমন একটা ব্যথা জমিয়া উঠিতে লাগিল। মনে পড়িল, আব কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার বিবাহ। যাহাকে জানে না, চেনে না, যাহার কোনো চিন্তাধারার সহিত তাহার পবিচয় নাই, তাহারই হাতে সে আপন জীবনকে তুলিয়া দিবে। যে-পথ দিয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হইবে সে-পথ যেন দুর্গম অন্ধকারে ভয়-ভীষণ, সমস্যা-সঙ্কুল, তাহার সহিত নিজেকে মিলাইতে হয়ত প্রাণান্তই হইবে। হউক বিলাত-ফেরৎ, হউক ভালো চাকুরে, হউক সে যতই সুজন ও শান্ত, কিন্তু সে কি এমনই সুন্দর, এমনই প্রাণ-চঞ্চল, তাহার হৃদয় কি এমনই দূরপ্রসারী, নারীকে খুশি করিবার কি তাহার এমনি মধুর আয়োজন?

ওগো কল্পময়ী!

শিলি মুখ ফিরাইল। তাহার চক্ষু-পল্লবেব গোড়ায়-গোড়ায় অশ্রুরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুখ তুলিয়া দেখিল, মাথায় টুপি দিয়া রমাপতি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। দুইটা হাত সে ট্রাউজারের মধ্যে ঢুকাইয়া সাহেবী ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান! প্রভাত-সূর্য্যের দিকে শতদল যেমন চোখ মেলিয়া তাকায়, তেমনি করিয়া শিলি কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার দিকে চাহিল। তারপর সে নিজেই রাগ করিয়া কহিল, ব'সে ব'সে তোমার হাসি দেখতে এলুম?

রমাপতি কহিল, চলো যাই ?

কোন্ চুলোয় ?

পতঙ্গের পাখা পুড়িয়ে দেবে না ?

শিলি কহিল, পতঙ্গ তুমি নয়, তুমি পাখী। আগুনের চেয়ে আলো তোমার প্রিয়, সেই আলোয় তোমার কলকুজন।

তবে নিয়ে চলো সেই পথ দিয়ে ?

সমুদ্র পার হয়ে যেতে হবে, মনে রেখো।

রমাপতি কহিল, তাই যাবো। আমাদের পথের নীচে তরঙ্গে তরঙ্গে উঠুক প্রচণ্ড প্রতিবাদ, ঝড়ের মেঘে নামুক প্রলয়ের অন্ধকার, মহাশূন্যের পথ দিয়ে চলো আমরা উড়ে যাই গান গেয়ে অসীম আলোর দিকে। চলো দেবি, জীবন আর মরণকে উত্তীর্ণ হই।

শিলি কহিল, কবিত্ব রাখো। কোথায় নিয়ে যেতে চাও ?

যদি তোমাকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে যাই ?

শিলি হাসিয়া জবাব দিল, তোমাকে দেখে ভুলতে পারি, কিন্তু পথ ভুল করব না। বাঙ্গালীর মেয়ে বাঁধা পথ ভোলে না।

রমাপতি কহিল, তুমি ত বলেছ আমার স্বভাবের মধ্যে আছেন ভোলানাথ, আমি চিরকাল পথ-ভোলা। সে কি মিথ্যে ?

না। শিব তুমি, যখন তুমি শান্ত , ভয়ভীষণ তুমি, যখন তুমি পথে নামবে অশান্ত হয়ে। কী দেখছ ?

তোমাকে দেখছি। আকাশ যেমন পৃথিবীকে দেখে চোখ মেলে। চলো আমার সঙ্গে তুমি।

কী পাবো তোমার কাছে ?—শিলি কহিল।

ভক্তের পূজোয় দেবী কি পান্ ? তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি-লাভের আশায় উপকরণ সাজিয়ে রেখেছি প্রচুর।

প্রাণহীন, হৃদয়হীন উপকরণ! ওদের দাম কি ? হাত ভ'রে তুমি দেবে, প্রাণ খুলে ত' দেবে না ?

রমাপতি কহিল, প্রাণ খুলেই দেবো, দেবি।

শিলি কহিল, সেই প্রাণ তোমার কৃপণতায় ভরা, সেখানে তোমার জহুরীর ব্যবসায়ের হিসাব। তোমার দারিদ্র্য দেখে তখন লজ্জা হবে। চাই, চাই, কেবল আমি চাই। হাত পেতেও নেবো, প্রাণ পেতেও নেবো, আমি যে মেয়ে! দিতে না পারলে তখন বাধবে সংঘাত, লক্ষ্মী হবে চঞ্চল। তুমি জানো দান করতে, দিতে জানো না।

কী তুমি চাও বলো?

উত্তপ্তকণ্ঠে শিলি কহিল, তরুণ সূর্য্যের কাছে দেবী কুন্তী কী চেয়েছিলেন মনে নেই তোমার? আলোর চেয়েও বড, চেয়েছিলেন সূর্য্যের হৃদ্‌পিণ্ড, অগ্নির উৎস। থাক্ থাক্, যেতে দাও আমাকে। কিছু পাওয়ার চেয়ে কিছুই না পাওয়া ভালো। সরো, পথ ছাড়ো।—বলিতে বলিতে শিলি উঠিয়া দাঁডাইল।

কিন্তু কথা বাকি রইল যে তোমার সঙ্গে?

কী কথা?

রমাপতি কহিল, তোমাকে যেতে দেবো না!

দোকানের লোকজনের দিকে তাকাইয়া শিলি কহিল, মনো রেখো এটা তোমার নিভৃত শয়ন-মন্দির নয়। আমার সম্ভ্রম বজায় রেখো।

এসো তবে আমার সঙ্গে।

দুইজনে বাহির হইয়া আসিল। একজন কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিল, কখন ফিরবেন ছোটবাবু?

রমাপতি কহিল, বলতে পারিনে, স্টোর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।

মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। রমাপতি উঠিয়া ষ্টিয়ারিঙ ধরিল, শিলি তাহার বাঁ দিকে বসিল। গাড়ী ছুটিল।

শিলি কহিল, তুমি আস্ত পাগল।

কিন্তু তুমি যে মাতাল!

মিছে কথা, মাতাল হয় পুরুষ, তারা মস্তিষ্কজীবী। আমরা জানি আনন্দকে, তারা জানে উপভোগ।—কোন্ দিকে যাচ্ছি?

রমাপতি কহিল, নরকের দিকে।

শিলি কহিল, ভয় দেখিয়ো না আমাকে, আমি জানি তুমি ব্যবসাদার। আমার অলঙ্কারের দাম থেকে পঁচিশটে টাকাও তুমি ছাড়োনি। নরকের পথে গেলে লোকসান, তাই তুমি যাবে না। তোমার চরিত্রে উচ্ছৃঙ্খল যদি বা থাকে, পাপ একটুও নেই।

তুমি জানো, তোমাকে ধ্বংস করতে পারি?

কোন্ অস্ত্র দিয়ে গো ঠাকুর, কে তুমি? তোমার রূপের মধ্যে পৌরুষ কোথায়? ওই চেহারা নিয়ে প্রেমিক কবির অভিনয় যদি বা জমে, শক্তিমানের অভিনয়ে পাস্-মার্কও রাখতে পারবে না। মনে করেছ তুমি, আমি কাঁদতেই পারি, পারি বুঝি কেবল বিপদে তোমার পায়ে ধরতে? মনে করেছ বিলাসের সঙ্গিনী হয়ে দাসীবৃত্তি করতে চলেছি? ভুল, ভুল, দাহ্য বস্তুর মধ্যে আগুন ধরিয়েছ, ঘর পুড়বে তোমারই। তুমি প্রলয়ঙ্কর, কিন্তু আমিও যে করালী কালী—নাচতে নাচতে যাবো তোমারই বুকের ওপর দিয়ে! চলো, চলো, নরকের পথেই চলো। দুজনেরই মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হোক।—শিলি তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিল।

রমাপতি গাড়ী ঘুরাইয়া হাসিয়া বলিল, তোমার সেই রূপ আমি দেখবো। দেখবো তুমি কেমন সর্ব্বনাশিনী!

শিলিও হাসিল। কহিল, দেখবে, তার আর দেরী নেই। বাহুবলের ভয় দেখিয়ো না, বলদপার অত্যাচারে কণ্ঠরোধ করতে চেয়ো না, পায়ে আমার শৃঙ্খল দিয়ে শক্তির দম্ভে আমার পরে স্বেচ্ছাচার করো না,—আমি জাগতে জানি। মদমত্তের অন্যায়, লোভীর লোভ, আর শক্তের অবিচারে তুমি যখন আমার প্রাণের দিগদিগন্ত ঘন অন্ধকারে ঢেকে আনবে,—চঞ্চল হবো আমি, প্রলয়ের প্লাবন আনবো আমি। চলো, ভয় করিনে কিছু, গ্রাহ্য করিনে পুরুষত্বহীন পুরুষকে।

রমাপতি বলিল, এতই যদি জানো তবে আমার আকর্ষণে চলেছ কেন ?

শিলি কহিল, মেয়েলি কৌতূহল মানো ? এও তাই। তোমাকে জানতে চাই তোমার উপকরণের ভেতর দিয়ে। মেয়েমানুষ যে হিসেবী, পালিশটা বাদ দিয়ে তারা চায় সারতত্ত্ব। চলো।

রমাপতি বলিল, কৌতূহল ছাড়া আর কিছু নেই তোমার ?

আছে বৈ কি, রাগ করো কেন ? আগে জানা, তারপরে জানানো, আগে পাওয়া, তারপরে দান—আমি যে মেয়ে !

বড়বাজারের এক অন্ধকার গলির ভিতর সঙ্কীর্ণ পথে গাড়ী, ঘোড়া, গোরু ও মানুষের অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এক জায়গায় গাড়ী আসিয়া থামিল। দুই জনে নামিয়া এক বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল।

সম্মুখে গুর্খা দারোয়ান বেয়নেট্‌ওয়ালা এক রাইফেল্ লইয়া দণ্ডায়মান, সেলাম করিয়া সে পথ ছাড়িয়া দিল। নীচেটা যেন ঘুট্‌ঘুটি অন্ধকার, অনেকগুলা অব্যবহৃত ঘর, পাথর-বাঁধানো উঠান, সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি ; কোথাও হাওয়া নাই, আলো নাই—কেবলমাত্র অনেক উঁচু হইতে আকাশের একটু সামান্য আলো নীচের দিকে নামিয়া আসিয়াছে, তাহাতে পাইপের জলটা চক্‌চক্ করিতেছিল। অন্ধকারে শিলি ঠাহর করিয়া দেখিল, নানা রঙের মোটা কাঁচের টুক্‌রো বসানো থামগুলি প্রেতের মতো দাঁড়াইয়া সহস্র চক্ষু দিয়া যেন ভয় দেখাইতেছে। চারিদিকে পুরাতন পাথরের গন্ধ ; যেন কোন্ কঠিন শীতল পাতালপুরী, যেন জটীল গোলক ধাঁধাঁ। এই পাষাণ প্রাচীর ঘেরা বিভীষিকাময় কারাগারের গর্তের মধ্যে আসিয়া শিলির বুকের ভিতর দুরু দুরু করিতে লাগিল। এমন বাড়ী কলিকাতায় আছে ইহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে ভয়ে ভয়ে রমাপতির হাত চাপিয়া ধরিল। রমাপতি কহিল, এই যে এই সিঁড়ি, এসো, কোনো ভয় নেই।

ও হরি, ও যে টাকার শব্দ, পাশেই মাড়োয়ারির গদি।

আমি আর যাবো না।

কেন ?

ভয় করে।

রমাপতি হাসিয়া বলিল, এ যে আমার বাড়ী, ভয় কি ?

শিলি অন্ধকারে তাহার মুখের দিকে তাকাইল। বলিল, তোমার চেহারাও বদ্‌লে গেছে এখানে এসে, তুমিও ভয়ঙ্কর।

তবে চলো ফিরে যাই।

না, যাবো না, শেষ ভয়টুকুও আমার কাটুক। বলিয়া সে আবার সেই সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বাহিয়া রমাপতির সহিত উপরে উঠিতে লাগিল।

রমাপতি কহিল, এই বাড়ীটা আগে ছিল এক মাড়োয়ারির, সে কেবল ঘরের পর ঘর বানিয়েছে, দালানও নেই, বারান্দাও নেই। ওরা বাগানও চায় না, অবকাশও চায় না,—ওরা চায় নিটোল নিরেট প্রাসাদ, অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন ! সাততলা গাঁথুনি, তার মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই। তারপরে এই প্রাসাদের কোন্ ঘরে পাওয়া গেল দুই রমণীর মৃতদেহ—

কী বল্‌ছ তুমি ?—শিলির গা কাঁপিয়া উঠিল।

হ্যাঁ, মৃতদেহ, একজোড়া। তাদের আবার মাথা ছিল না। ছিন্ন মস্তা !—তারপরে মোকদ্দমা, তারপরে তারা সর্ব্বস্বান্ত !

শিলি কহিল, আর কত দূর ?

রমাপতি কহিল, তিন তলা পার হয়েছি, পাঁচতলায় আমার ঘর।

চারতলায় উঠিয়া মানুষের আওয়াজ পাওয়া গেল। পাশেই একটা ঘর। ভিতর হইতে একজন সাড়া দিল। বলিল, কে ?

রমাপতি পর্দ্দা তুলিয়া হাসিল। সেই ফাঁকে দেখা গেল, আলো জ্বালিয়া কয়েকটা লোক চুপি চুপি তাস খেলিতেছে। রমাপতি জিজ্ঞাসা করিল, কত হোলো জীবন দাস ?

আজ্ঞে প্রায় চার হাজার।

বটে ? কালকের সাত শো তবে শোধ ক'রে দিয়ো। বলিয়া সে আবার উপরে উঠিতে লাগিল।

শিলি কহিল, কী হচ্ছে ওখানে ?

ও কিছু না, এক রকমের জুয়া। ওর নাম ফ্লাশ। লুকিয়ে খেলতে হয়।

কেন ?

সে আর ব'লো না, পুলিশ বেটাদের জন্যে আজকাল—এসো, এই আমার ঘর।—নন্দা সিং ?

হুজৌর!—বলিয়া কোথা হইতে দৈত্যের মতো একজন হাফ্‌প্যাণ্ট পরা নেপালী আসিয়া দাঁড়াইল। রমাপতি তাহার হাতে একগোছা চাবি দিয়া কহিল, খুলো।

এই আমার ঘর! হ্যাঁ, অনেক বড় হল্ ঘরের মতন। কী দেখ্‌ছ? অন্ধকার মনে হচ্ছে ?

শিলি কহিল, তোমার আত্মীয়স্বজন ?

রমাপতি হা হা করিয়া হসিল। বলিল, ও সব বালাই নেই। ওদিকের বারান্দার সব খালি, কেনবার পর থেকে আজো খুলে দিখিনি সেগুলোর মধ্যে কি আছে! ভয় পাও কেন শিলি ?

কা'রা দাঁড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে ? কড়িকাঠের নীচে ওসব কী ?

আরে পাগল তুমি। ওগুলো সব মেহগিনি কাঠের আসবাব, ওরা প্রেত নয়! ওদের মাথায় সোনা-রূপোর বাসন। অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছ না?—এই নাও। বলিয়া রমাপতি আলোটা জ্বালিয়া দিল।

শিলি কহিল, মানুষ নেই কোথাও এদিকে ?

আছে বৈ কি! এটা বড়বাজার, অহোরাত্র এখানে মানুষ। বাইরে এখনো আছে দুপুর বেলাকার আলো···অবশ্য এখানে আলো আসতে পারছে না।

শিলি একটা চৌকীতে বসিল। চারিদিকে ঠাসা জিনিসপত্র; অযত্নে ধূলায় লুটানো জরির বাণ্ডিল্, একদিকে লাল মখমলের সজ্জা, রেশম ও সাটিনের পরিচ্ছদ, শ্বেত-পাথরের আসবাব, তারপর সোনা-রূপা, তারপর পিতল কাঁসা ছবি আর ঘড়ি বিচিত্র বিপুল ও বিস্ময়কর এই রহস্যালোক। মেঝে দেখা যায় না, কোমল রঙিন বহুচিত্রিত কার্পেটে মোড়া। তাহারই উপর ছড়ানো

নানা রকম কাঠ ও পাথরের জিনিসপত্র, পা বাড়াইবার উপায় নাই। ঘরের ভিতরে সহস্র সহস্র টাকার সাজ-আসবাব যেন কতকাল হইতে এই অন্ধপুরীর মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, যেন কবরের মৃত্তিকার নীচে বন্দিনী প্রেতিনীর দল দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

রমাপতি কহিল, এসো এদিকে—

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শিলি তাহার দিকে সরিয়া গেল, আর যেন তাহার নিজের সত্তা বলিয়া কিছু নাই। রমাপতি তাহার দুই হাত ধরিয়া হাসিল। অন্ধকারে তাহার মুক্তার মতো দাঁতগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। শিলি কম্পিতকণ্ঠে কহিল, কী চাও তুমি?

এর ওপর বসো। ভয় কি? এটা একটা সিংহাসন, ব্রোন্‌জের তৈরী।— —বলিয়া সে শিলিকে কি একটা ধাতু নির্ম্মিত উঁচু আসনের উপর বসাইয়া দিল, তারপর সরিয়া গিয়া সুইচ্‌ টিপিয়া একটা বড় আলো জ্বালিল। সেই আলোয় বিরাটকায় এক লোহার আলমারি খুলিতেই ভিতর হইতে বিচিত্র জহরতের সম্ভার ঝলমল করিয়া উঠিল। তাহাদেরই প্রতিবিম্বিত আলো দূরে গিয়া পড়িল শিলির মুখে চোখে।

একে একে রমাপতি জড়োয়া জহরতের অলঙ্কার বাহির করিয়া আনিল। শিলি কহিল, কি করবে ওগুলো?

তোমাকে দেবো।

আমার কী হবে? আবার তুমি ঐশ্বর্য্য দেখাতে চাও?

রমাপতি কহিল, আমি দেখতে চাই তোমার পরিপূর্ণ রূপ!

তুমি কি এম্‌নি করেই সর্ব্বস্বান্ত হবার অভিনয় করবে?

সর্ব্বস্বান্ত হ'তে আমার বাকি নেই শিলি। সাত লক্ষ টাকা কোম্পানীর দেনা, এই বাড়ী বাঁধা দেওয়া, বিলেতের এক জহুরী আমাদের নামে নালিশ করেছে,—ডুবতে আর আমাদের দেরী নেই। সুনাম, প্রতিপত্তি, কারবার— সমস্তই যাবে। তবু আমার এই শেষ দান তোমাকে গ্রহণ করতে হবে, দেবি। —এই বলিয়া সে শিলির মাথায় এক মুক্তার মুকুট পরাইয়া দিল।

শিলি কহিল, তুমি জানো আমার বিবাহ আসন্ন? জানো দ্বিতীয় কোনো পুরুষের সংস্পর্শে আসা আমার পক্ষে অনেক বড় পাপ?

জানি। এও জানি তুমি আমার জীবন-মরণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! কোথা যাবে তুমি আমাকে ছেড়ে?—বলিয়া রমাপতি তাহার মাথার চুলে গাঁথিয়া একটি হীরা-খচিত টায়রা পরাইয়া দিল।

তুমি কি কিছুই মানো না? বিপ্লবকেও ভয় করো না?

না।

আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ? বিয়ে করবে আমাকে?

না! ওটা নোংরামি, বিয়েটা হচ্ছে পুরুষের পদস্খলন!

তবে? তবে তুমি কী চাও, রাক্ষস?—শিলি চীৎকার করিয়া উঠিল।

তোমাকে পূজা করব। তুমি আমার কল্পলতা। তোমার নাচের তালে তালে উঠ্‌বে আমার বুকের রক্ত দোল খেয়ে, ছন্দে ছন্দে চল্‌বে আমার উন্মত্ত প্রাণের স্পন্দন। না, না,—লজ্জা ক'রো না আজ, বাধা দিয়ো না আমার দুরন্ত উল্লাসকে—

তাহাকে বাধা দিতে গিয়া শিলি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, পায়ে পড়ি তোমার······না, কিছুতেই না বাঁচাও আমাকে, আমাকে বাঁচাও তুমি— আমি ভদ্রঘরের মেয়ে—

রমাপতি বাধা মানিল না, আপন শক্তিতে সে নিজের কাজ করিয়া গেল। তারপর একটি সুন্দর সাতলহরী মুক্তার মালা তাহার গলায় পরাইয়া বলিল, জানি, এর পরে আরো অলঙ্কার পরাবো, তুমি আরো দেবে বাধা। কিন্তু বাধা ত আমি মান্‌বো না, শিলি! নাও, উঠে দাঁড়াও?

শিলি ভয় পাইয়া কহিল, আবার? এর পরেও অপমান করতে চাও?

না। তোমার রূপের মূল্য দিতে চাই। সেই চোখ দিয়ে তোমাকে দেখবো, যে চোখে মহাকবি দেখেন নন্দনবাসিনী উর্ব্বশীকে!

কবির চোখ পেয়েছ, রুচি আর মন ত' নেই তোমার?

তাই ব'লে দেখার সাধ কি অপূর্ণ থাকবে? শুধু দেখা নয়, অলঙ্কৃত করবো তোমার সর্ব্বাঙ্গ। সেই স্বপ্ন আমার মিথ্যা করে দিয়ো না, শিলি?

বেশ, তবে স্পর্শ করো না আমাকে। দাও অলঙ্কার, নিজে আমি পরবো।—হীরা ও মুক্তার নানা অলঙ্কার লইয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ করিয়া শিলি একটি একটি করিয়া তাহার দুইখানি পা পর্য্যন্ত পরিয়া লইল।

দাঁড়াও সোজা হয়ে এইবার?

শিলি দাঁড়াইল স্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টি লইয়া। চোখে তাহার সেই অহঙ্কার, যে অহঙ্কারে সামান্য মেয়ে পুরুষের নিকট মহীয়সী হইয়া উঠে। সেই রূপ নারীর নয়, বিশ্বপ্রকৃতির। তাহার চোখে অশ্রু শুকাইয়া গেল, অধরে তাহার কঠিন প্রতিজ্ঞার আভাস, ললাটে দৃঢ়তা, দুই হাতে শক্তি, অকম্পিত বক্ষ, দুই পায়ে অজেয় সাহস।

কিয়ৎক্ষণ পাষাণ-মূর্ত্তির মতো দাঁড়াইয়া রমাপতি মাথা হেঁট করিল, তারপর সহসা নীচের সিঁড়িতে কাহাদের পায়ের শব্দ পাইয়া দ্রুত বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

শিলি ভাবিল, এ কেমন মানুষ! কোন্ রহস্যপুরীতে টানিয়া আনিয়া কী অসাধ্য সাধন করিতেছে? ইহার সংসার নাই, আত্মীয়বন্ধু নাই, জীবনের কোনো শৃঙ্খলা নাই! আদর্শহীন, লক্ষহীন—মানে না লোকাচার, জানে না ভয়। সজ্ঞানে চলিয়াছে সর্ব্বনাশের দিকে, ইহার ভরাডুবি হইতে আর বিলম্ব নাই—শিরার রক্তের মধ্যে ধ্বংস ও উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে! পাপ-পুণ্য ইহাকে স্পর্শ করে না, নীতি ও দুর্নীতির সংস্কার ইহার কাছে হাসির বস্তু, ন্যায় ও অন্যায় ইহার নিকট ছেলেখেলা! শিলির মনে হইল, নিষ্ঠুর তান্ত্রিকের মতো রমাপতি যেন অনির্ব্বাণ হোমকুণ্ড জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, জীবন ভরিয়া এক দীর্ঘ যজ্ঞ চলিয়াছে, তাহার সেই আগুনে পুড়াইবার জন্য পথের মানুষকে সে ধরিয়া আনে!

শিলি ভাবিল ইহারই কি নাম প্রতিভা? মহৎ মানুষ নয়, নীচ চরিত্র নয়, কিন্তু বিচিত্র মানুষ! যেন এক বিরাট প্রতিভা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া এই

পাষাণ-পুরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়াইয়া রহিয়াছে! জ্ঞানের আলো ইহার চোখে নাই কিন্তু ইহার বুভুক্ষু আত্মার সর্ব্বনাশা আগুন হা হা করিয়া ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছে। ইহারই কি নাম শিল্পী? ইহারই কি নাম জহুরী? যাহাকে উন্মাদের মত কাছে টানিয়া আনে তাহার আকণ্ঠ কেবল গরলেই ভরাইয়া দেয়? কে ইহাকে ভালোবাসিবে? কোন্ মেয়ে ইহাকে বিবাহ করিয়া নিজের জীবনে সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালাইতে চাহিবে? ইহার অবিরাম বহ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিতে ইহার উজ্জ্বল লোলজিহ্বা কেবলই যে দীর্ঘতর হইতে থাকিবে!

বাহিরে কয়েকজন পুরুষের গলার আওয়াজ পাইয়া শিলি ভীত দৃষ্টিতে তাকাইল।

কাহারা যেন চাপা কণ্ঠে আলোচনা করিতেছে। কী যেন একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র! এখান হইতে পলাইবার আর কোনো পথ নাই। চিরদিন এই অন্ধকূপে বন্দী হইয়া থাকিলেও কেহ জানিবে না, চীৎকার করিলে কোথাও সাড়া পৌঁছিবে না। যে দুইটি রমণীর মৃতদেহ এই প্রাসাদের এক কক্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহারাই কি তাহাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী? এই হত্যা-শালায় যে কেহ আসিলেই কি তাহাকে প্রাণ দিতে হয়? মণিমুক্তার স্তূপের ভিতরে কি তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে? সাতলহরী মালার ফাঁসীতে লট্‌কাইয়া কি তাহার প্রাণ বাহির করিয়া লয়?

হাসির আওয়াজ আসিল। যেন প্রেতের অট্টহাসি, যেন শিকার মিলিয়াছে, যেন হিংস্র শ্বাপদের গুহায় মানুষ পড়িয়াছে! কিন্তু শিলি কান পাতিয়া শুনিল,—না, হাসি নয়, পুরুষের কান্নার শব্দ! পুরুষ কাঁদিল কেন? কে কাহার বুক দিল ভাঙিয়া? তবে কি পাষাণের ফলকে পুরুষের কান্নাও জমা আছে? তবে কি পুরুষের নিষ্ঠুরতা পুরুষকেও ক্ষমা করে না?

কিয়ৎক্ষণ পরে কোলাহল শান্ত হইলে এক সময় রমাপতি আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। দেখিল, মাথায় মুকুট ও গলায় মুক্তার মালা পরিয়া শিলি সিংহাসনের

উপর নীরবে বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সে মুখ তুলিল। বলিল, কে ওরা? কেন কাঁদছিল?

রমাপতি বলিল, ওরা আমার অনুচর। আর একটা কারবার ফাঁদছি, ওদের মোতায়েন করেছি সেই কাজে।

কিসের কারবার?

রমাপতি কাছে আসিয়া তাহার দুই হাত ধরিল। কহিল, শুনতে চাও? কিন্তু বিশ্বাস ক'রে বল্‌ছি তোমাকে। এই জহরতের ব্যবসা যেদিন যাবে লিকুইডেশনে, এ-কাজ সেদিনকার ভরসা। উত্তর কল্‌কাতার প্রান্তে এক জঙ্গলে কিছু জমি লিজ্‌ নিয়েছি। সেখানে বাড়ী তৈরী হচ্ছে, সেই বাড়ীর নীচে মাটির তলায় সুড়ঙ্গের পথে মদ চোলাই করব, বিলেতী লেবেল্‌ দিয়ে বিক্রি করব বাজারে। মানে, লিমিটেড কোম্পানী! দুজন মাড়োয়ারী, তিন জন ইহুদী, দুজন সাহেব, আর এই অধম।

এই জোচ্চুরী যেদিন পুলিশে ধরা পড়বে?—শিলি কহিল।

রমাপতি হাসিল। কহিল, লাখ কয়েক টাকা লাভ করবার আগে ধরা পড়বো না, এমন ব্যবস্থা করা আছে, শিলি!

শিলি কাঠ হইয়া প্রশ্ন করিল, তুমি মদ খাও?

খাইনে, লোককে খাওয়াই! নির্ব্বোধদের খাইয়ে কাজ আদায় ক'রে নিই।—বলিয়া রমাপতি পাণ ও সুপ্তি চিবাইতে লাগিল। পুনরায় কহিল, জীবনে কোনো নেশাই আমি করিনি।

ওরা কাঁদছিল কেন তোমার কাছে?

আর ব'লো না! বেচারী মূলচাঁদ! আমার কাছে হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার নিয়ে ধরেছিল একটা ঘোড়াকে—মানে, ঘোড়দৌড়ের কথা বল্‌ছি, ঘোড়াটা টক্কর খেয়ে হেরে গেল। লাখ চারেক টাকা লোকসান।

তুমি জুয়া খেলো?

মূলচাঁদ যে আমার চেয়েও বড় জুয়াড়ী! কিন্তু গেল আমারই টাকা, ও বেচারিকে ত আর জেলে দিতে পারিনে। আমারই কাছে সন্ধান পেয়ে

ওই ঘোড়াটা ও ধরে। তাই কাঁদছিল আমার কাছে এসে। ওর কান্না দেখে হেসে বাঁচিনে। বুকের ছাতি ছোট কিনা!

শিলি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সকলের চেয়ে তুমি ভয়ঙ্কর, কিন্তু কেন চলেছ এই ধ্বংসের পথ দিয়ে? কেন আয়োজন করছ তোমার ভীষণ সর্ব্বনাশের? কী আনন্দে তুমি মাতাল?

খেয়ালের খেলা!—বলিয়া রমাপতি হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে বলিল, কী সুন্দর তুমি, ললাটের মুকুটে তোমাব লক্ষ তারকা জ্বল্‌ছে, কণ্ঠে তোমার মুক্তার সমুদ্রের সাতটি লহর, তোমার নয়নে আর চরণে আর যৌবনে আমার চিরমরণ, তোমার দুই বক্ষে আমার সৃষ্টি আর ধ্বংস—কী রূপ তোমার! মধুর পাত্রে জড়িয়ে গেল মধুমক্ষিকার পাখা!—সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

শিলিও ভুলিয়া গেল ভয়, ভুলিয়া গেল বিপদ, ভুলিয়া গেল এই কারাগারের বিভীষিকা। মোহাবিষ্ট হইয়া মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, দুরন্ত তুমি। তুমি ভয়ঙ্কব। তোমার উৎপীড়নের দুর্গম পথ পার হয়েও তোমাকে কেন যে ভালো লাগে! বিশ্বজয়ী তোমার রূপ। অনন্ত তোমার যৌবন—অথচ রুদ্রের মতন তুমি অশান্ত—বলিতে বলিতে তাহার গাল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সিংহাসন হইতে নামিয়া দুই হাতে রমাপতিকে ধরিয়া তাহার বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া সে পুনরায় কহিল, তোমাকে নিতে পারবো না। তোমাকে দিতে পারব না। আমি মেয়েমানুষ, নিভৃত নিশ্চিন্ত ঘরই আমার প্রিয়। নীতি আর শৃঙ্খলায় আমার সঙ্কীর্ণ জীবনধারা বইতে চায়। ওগো, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

রমাপতি কহিল, আর ভালোবাসা?

না, না, ও কিছু নয়। ও তোমার জন্যে নয়, ওর দিকে তুমি চেয়ো না। তুমি থাকো মরুভূমি নিয়ে, সমুদ্র নিয়ে, অভিসম্পাৎ নিয়ে। আমাকে যেতে দাও লোকালয়ে, স্নেহ-ভালোবাসা-মমতার স্নিগ্ধ ছায়ায়, আমি গ্রামের নদী—ওগো, আমাকে তুমি মুক্তি দাও।

মাথায় মুকুট পরিয়া শিলি রমাপতির পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। রমাপতি তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া দাঁড় করাইতেই সে কহিল, পাপপুণ্যের বোধ তোমার নেই, তাই তুমি এত বড। দুষ্কৃতির পথ দিয়েই তুমি একদিন পাবে তাঁকে, যাঁকে আমরা বলি পরমেশ্বর! তোমার সকল অন্যায় আর দুর্নীতি তোমার মাথায় পরিয়ে দেবে গৌরবের মুকুট।

বলো, তুমি নেবে এই মুকুট, এই মুক্তোর মালা, এই সমস্ত জহরৎ?

শিলি দুই হাত পাতিয়া বলিল, দাও, সব দাও, যা কিছু তোমার ঐশ্বর্য্য আজ আমি মাথায় তুলে নিয়ে যাবো! তোমার দান প্রাণ পেতে নিলাম কিন্তু আমি কী দিতে পারি? আমি যে বড দরিদ্র!—বলিয়া সে তাহার উৎসুক সুন্দর মুখ রমাপতির দিকে তুলিয়া ধরিল।

বাহির হইতে নন্দা সিং সাড়া দিল, হুজৌর!

হাঁ।

এক সাহেব আয়া। ব্রড্‌লি উন্‌কা নাম।

আনন্দে দপ্‌ করিয়া রমাপতি জ্বলিয়া উঠিল। লাফাইয়া হাসিয়া কহিল, হয়েছে হয়েছে, কাজ হাসিল হয়েছে! শিলি, রাজ্য জয় করেছি, একটু বসো তুমি, একটু, সব বল্‌ব তোমাকে—এখুনি আসছি। ওই—ওই এসেছে ব্রাড্‌লি—

তাহার হাত ধরিয়া শিলি কহিল, কখন আসবে? দিলে না যা চাইলুম? তাহার চিবুকে হাত দিয়া রমাপতি বলিল, নিবিড ক'রে এঁকে দেবো। আসছি এখুনি।—বলিয়া পাশের দরজা দিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

মনে হইল নন্দা সিংও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। নিস্তব্ধ নির্জ্জন বাড়ীর ভিতরে দুই জনের নাল-বাঁধানো জুতার খট্‌ খট্‌ শব্দ দূর হইতে দূরে যেন কোন্‌ অতল তলে একটু একটু করিয়া মিলাইয়া গেল। শিলি তাহার উৎসুক চুম্বন-তৃষ্ণা লইয়া বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা পিছন দিক হইতে লঘু পদশব্দ শুনিয়া সে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। দেখিল, একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক তাহার দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিজেকে সম্বরণ করিয়া শিলি তাহার কাছে সরিয়া আসিল। আলোয় দেখা গেল, তাহার সিঁথিতে এয়োতির চিহ্ন। তাহার চোখে মুখে উত্তেজনা।

সে কহিল, কে ভাই তুমি? তোমাকে যেন চিনি মনে হচ্ছে?

মেয়েটি কহিল, চেনো?

হ্যাঁ, চিনেছি। একটু আগে তোমাকে এঁদের দোকানে দেখে এলুম, তাই না? তোমার নাম কি?

সবিতা। তুমি কেন এসেছ এখানে?

শিলি কহিল, এনেছেন আমাকে রমাপতিবাবু। একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি আসবেন তিনি।

তাহার কপালে মুকুট, গলায় মালা, এবং তাহার বিস্ময়কর রূপরাশির দিকে তাকাইয়া সবিতা হঠাৎ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, কেন এলে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করতে? আমার যে আর দাঁড়াবার কোন জায়গা নেই?

কী বল্‌ছ ভাই?

সবিতা চীৎকার করিল, নিজের মাথার চুল দুই মুঠায় টানিতে টানিতে কাঁদিয়া বলিল, আমি যে স্বামীকে ছেড়েছি ওর জন্যে! আমি যে জলাঞ্জলী দিয়েছি আমার সংসার! তোমার সহ্য হোলো না, এলে রাক্ষসীর মতন ওকে গ্রাস করতে?

তাহার চীৎকারে সেই পাষাণের কারাগার বিদীর্ণ হইতে লাগিল। শিলি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে একবার তাকাইল, কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। ইহাকে থামাইবার সাহস নাই, সান্ত্বনা দিবার ভাষাও নাই।

সবিতা কহিল, ডাকিনী, কেন এসেছিস? পরের সুখ সহ্য হোলো না? পরের ভালো দেখে তোর বুক ফাট্‌ল?

শিলি কহিল, কেন ভাই রাগ করছ?

সবিতার যেন কোন্ ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ঝরিতেছিল !

উন্মত্তকণ্ঠে সে বলিল, দূর হয়ে যা, চুলোয় যা,—এত হিংসে? এত পরশ্রীকাতরতা ?

শিলি কহিল, আচ্ছা যাচ্ছি, চেঁচিয়ো না তুমি !

সবিতা তৎক্ষণাৎ শান্ত হইল। বলিল, ঠিক যাবে ?

হ্যাঁ ঠিক যাবো, তুমি কেঁদো না।

আর আসবে না ?

শিলি কঠিন কণ্ঠে কহিল, কোনোদিন আসবো না, কোনোদিন আর তোমার রমাপতিকে দেখা দেবো না। যাচ্ছি আমি।

ঘন কালো মেঘের ভিতর দিয়া আলো ফুটিয়া উঠিল। সবিতা কহিল, বাঁচলুম, কী যে ভয় হয়েছিল তোমাকে দেখে ! জানো ত' পুরুষের মন, হয়ত তোমাকে দেখে ওর মন টল্‌তে পারে। হয়ত এর পরে আমাকে অবহেলা করবে —বুঝলে না ? তুমি কুমারী, তোমার রূপ আছে তাই ত' আমার ভয় !

শিলি হাসিল। বলিল, সে ভয় তোমার নেই, নিশ্চিন্ত থাকো তুমি। কতদিন তোমার সঙ্গে রমাপতির আলাপ ?

এই আজ তেরো দিন হোলো।

ও, মাত্র তেরো দিন !

সবিতা বক্র বিদ্রূপ করিয়া কহিল, আত্মীয় যে হয় তেরো মিনিটেই হয়। আমার এক মাসতুতো বোন গলায় দড়ি নিলে ওর জন্যে, তবু ওকে পেলে না। ও যে আমার, ওকে নেবে কে ?

শিলি কহিল, কিন্তু তোমার স্বামী ত আছেন !

আছেন বৈ কি, একটি কোলের ছেলে—আর একটিও—বলিয়া সবিতা নিজের দেহের দিকে তাকাইল।

শিলি আতঙ্কিত হইয়া বলিল, সে কি, সন্তানের মা তুমি ! ছি, এমন কাজ করতে নেই, তুমি অত্যন্ত বিপদে পড়বে,—এরা উচ্ছৃঙ্খল মানুষ, এদের মোহে আচ্ছন্ন হ'তে নেই। তুমি ঘরে ফিরে যাও ভাই !

দেখিতে দেখিতে সবিতার মুখ আবার বিকৃত হইয়া উঠিল। কুৎসিত ভঙ্গী করিয়া কহিল, ভাড়িয়ে নিতে চাও, কেমন? মিষ্টি কথায় আমাকে ভুলিয়ে নিজের কাজ হাসিল্ করতে চাও! বড়লোক দেখেই বুঝি তোমার এই লোভ? এত লালসা তোমার, এমন জানোয়ারের মতন জঘন্য প্রবৃত্তি? কেন, দেশে আর পুরুষ নেই? আমার খাবার ছোঁ মারতে এসেছ, ভয় নেই কালীঘাটের কুকুর হবার? দূর, দূর, দূর হয়ে যাও! হিংসার চেহারা দেখিয়ে নষ্ট করতে চাও ত্যাগের যজ্ঞকে? জানোয়ারের দেহ-লালসা দিয়ে জয় করতে চাও প্রেমের ঠাকুরকে? ওরে পথের কুকুর!

শিলি তাহার গায়ে হাত রাখিয়া স্নেহের হাসি হাসিল। বলিল, যাচ্ছি ভাই, তোমার উত্তেজনা শান্ত করো। এই নাও—বলিয়া নিজের মাথার মুকুট লইয়া সে সবিতার মাথায় পরাইয়া দিল, গলার মুক্তার মালা খুলিয়া তাহার গলায় পরাইল, আংটিটা দিল তাহার আঙ্গুলে, তারপর পুনরায় বলিল, সব নাও, আমি কিছুই নিতে আসিনি। যদি এই অলঙ্কার ধারণ করে রাখতে পারো তবে দূরে থেকে আমি সুখী হবো। ভগবান যেন তোমাকে সকল বিপদ থেকে মুক্তি দেন। আচ্ছা ভাই, এই তোমার সঙ্গে প্রথম আর শেষ দেখা। আমাকে মার্জ্জনা ক'রো। বলিয়া সে আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে বাহির হইয়া অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া চলিল।

পথের উপরে ঝাঁপ দিয়া সে আলো দেখিতে পাইল,—বিকালের সুন্দর উজ্জ্বল আলো; মানুষ দেখিল,—দ্রুত ধাবমান অপরূপ বিচিত্র মানুষ; ট্রাম, মোটর, গরুর গাড়ী, ঘোড়া, দোকান, পথের পর পথ। বাতাস লাগিল তাহার মুখে-চোখে, তাহার প্রাণে-মনে। বুক ভরিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস লইল। তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল কিন্তু প্রেতলোকের জটিল জাল ছিন্ন করিয়া সে পুনরায় জীবন লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে। নতুন পৃথিবীতে সে আবার আসিয়া নামিল। এবারে সে কোন্ দিকে যাইবে? কোন্ পথ দিয়া কোন্ পথে? সকল পথ তাহার হারাইয়াছে। যেন স্মৃতিবিভ্রম! যেন পূর্ব্বজন্মের আর কিছুই তাহার মনে পড়িতেছে না।

লোকযাত্রার ভিতর দিয়া খানিকক্ষণ সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। মানুষের ভাষা সে ভুলিয়া গিয়াছে,—সেই প্রেতলোকের হাওয়া এখনও তাহার গায়ে জড়ানো, তাহার পরিচ্ছদের পাটে পাটে এখনও সেই বিভীষিকা।

একখানা ট্যাক্‌সি যাইতেছিল, হাত বাড়াইয়া তাহাকে থামাইয়া শিলি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ক্লিষ্টকণ্ঠে কহিল, ভবানীপুর!

এইবার সে নিশ্বাস ফেলিল। অদ্ভুত মদিরার নেশায় তাহার চোখে দেখিতে দেখিতে তন্দ্রা নামিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু চোখ বুজিতে তাহার সাহস নাই! চোখ বুজিলেই সেই অন্ধকার, সেই দুঃস্বপ্ন!

প্রজাপতির পাখা রঙীন হইয়া উঠিল। কয়েকদিন আগে পাকা দেখা হইয়া গিয়াছে। আজ বিবাহ।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, পরিচিত, ইতর, ভদ্র,—কেহ আর বাদ গেল না। সকাল হইতে সানাই বসিয়াছে। নিতান্তই প্রচলিত বিবাহ।

তা হোক, নতুন বৈচিত্র্য বড় বিপদ আনে। অতঃপর সমান বাঁধা রাস্তা। —পাত্রটি ভালো। শিক্ষিত, সভ্য, বিনয়ী, সদালাপী, বিলাত-ফেরৎ। বিষয়ী তাহার মন, বিচার-বিবেচনায় তাহার খ্যাতি, প্রেমিক পুরুষ। তাহার রূপ আছে, গুণ আছে, শৃঙ্খলা ও নীতিবোধ আছে। এই ভালো। নিশ্চিন্তে গৃহধর্ম্ম পালন করার পক্ষে এই সৎপাত্রই কাজে লাগে।

বর আসিল। বাজনা-বাদ্য, শঙ্খ, হুলুধ্বনি, পুষ্প-বর্ষণ, আলো, হাসি, আদর-আপ্যায়ন। উভয় পক্ষে সামাজিক সৌজন্য, কুটুম্বিতা, গাল-গল্প রসিকতা। তারপর লুচি সন্দেশ দধি। যথারীতি স্ত্রী-আচার ছান্‌লাতলা সম্প্রদান। পরিশেষে বাসর ঘর। অর্থাৎ মসৃণ নিখুঁৎ নির্ভুল পথ।

পরদিন বর বিদায়। হাসির পরে অশ্রু। প্রতিমা বিসর্জন। নবপরিণীতার কণকাঞ্জলী অর্থাৎ তোমাদের ভাত-কাপড়ের ঋণ শোধ করিয়া গেলাম। শানাই জোরে বাজিল। গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাঁটছড়া বাঁধা স্বামী-স্ত্রী গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

সকলে গাড়ী ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, সবাই কাঁদিয়া আকুল। জিনিসপত্র উঠিয়াছে। এমন সময় ভিড়ের ভিতর হইতে ছোটপিসি পথ কাটিয়া গাড়ীর দরজার কাছে আসিল।

ভিতরে শিলি ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিল, কোনোদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহার শূন্য দৃষ্টিটা আত্মগত। কুশণ্ডিকা হইয়া গিয়াছে সুতরাং তাহার মাথার সিঁথি ও রুক্ষ কেশরাশি সিঁদুরে-সিঁদুরে রাঙা। সুন্দর নববধূর বেশ-ভূষা তাহার। গতকালের কুমারী শিলির সহিত আজিকার বধূ শেফালিকার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। পাশেই তাহার স্বামী, তাহার পরমগুরু। ছোট-পিসি কাঁদিয়া তাহার হাত ধরিল।

যেন কোথায় কি ঘটিয়া যাইতেছে যেন কিছু মনে নাই, যেন ইহাই নারীর জীবন, ইহাই তাহার নিয়তি। ইহাতে সুখও নাই, দুঃখও নাই, ইহা যেন অবশ্যম্ভাবী! বিবাহ-ব্যাপারটার প্রয়োজন নারীর সুবিধার জন্য।

গাড়ী ছাড়িবার আগে ছোটপিসি আঁচল খুলিয়া সেই বহুমূল্য মুক্তার মালা বাহির করিল। তারপর তাহা শিলির গলায় পরাইয়া দিয়া কহিল, এই আমার আশীর্ব্বাদ। এই মালা যেন তোর গলায় থাকে চিরদিন।

শিলি কথা কহিল না, কেবল তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িল। হয়ত সে ভাবিতেছিল, আবার মুক্তার মালা! তবে কি অভিশপ্ত এই মুক্তার হলাহল চিরদিনই তাহার কণ্ঠের গোড়ায় লাগিয়া থাকিবে?

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পুরানো কথা ঃ

কতদিন হইতে যে সে-বাড়ী খালি পড়িয়া আছে তাহা কেহ জানে না, কখনও কেহ যে এই জীর্ণ আচ্ছাদনটির তলায় সুখ-দুঃখের পসরা মাথায় করিয়া বাস করিয়াছিল তাহাও কেহ বলিতে পারে না। গ্রীষ্মের প্রখর দীপ্তি, বর্ষার প্লাবন, হেমন্তের হিম আবার বসন্তের দক্ষিণ হাওযাব শিহরণে সেটা এখনও একেবারে ধ্বসিয়া যায় নাই বটে তবে সম্মুখেব পুরাতন জানালাহীন নীচু ঘরগুলায় ছাদের ভিত্তিতে প্রায় আধ হাত পরিমাণ ফাটল ধরিয়াছে এবং তাহারই ফাঁকে রাজ্যের বাদুড় চামচিকি প্যাঁচা সকলেই বহুদিন হইতে আপন আপন কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। বাড়ীখানার সুমুখে বিঘা-দুই পোড়ো জমি, তাহারই স্থানে স্থানে গোটা-কয়েক পত্রহীন শুষ্ক নারিকেল গাছ প্রাণহীন দেহ লইয়া কতদিন হইতে আকাশ পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীর পিছন দিকে একটা ডোবা পানায ভরা ; তাহার অব্যবহার্য্য জলটুকুও কোন্ তলায় পড়িয়া আছে, বৃষ্টিতেও তাহার পরিমাণ বাড়াইতে পারে না, মাটিতে শুষিয়া লইলেই যেন বাঁচে।

জনহীন স্তব্ধ পুরী দিবায় নিশায় খাঁ খাঁ করে, ঝি ঝি ডাকে, শেয়ালরাও চার প্রহরে চারবার কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়।

সেদিন সকাল-বেলায় কিন্তু পাড়ার দুই একজন লোক সবিস্ময়ে দেখিল, দুই তিনখানা জীর্ণ কাঁথা কার্ণিশটার উপর ঝুলিতেছে। একটি মেয়েকেও নাকি ঘুরিতে ফিরিতে দেখা গিয়াছে।

কথাটা সত্যই। গত কাল সন্ধ্যাবেলা মনোরমা এখানে আসিয়াছে। সঙ্গে স্বামী মন্মথ ও রুগ্ন আট বছরের মেয়েটা। এতদিন কোথায় একটা গ্রামে মন্মথর দূর সম্পর্কের এক বোনের বাড়ীতে তাঁরা ছিলেন, কিন্তু ম্যালেরিযার মহামারীতে সেখানে আর থাকা কিছুতেই চলিল না। আজ কয়দিন হইল মনোরমার কোলের একটি ছেলেকে সেই রাক্ষস খাইয়া ফেলিয়াছে।

বিবাহের পর এই মনোরমা স্বামীর ভিটায় পা দিল। সেই তের বছর বয়সের

বউ—ঘোমটার ভিতর হইতে তাকাইতে যখন ভয় করিত তখন হইতে এই বাড়ীর কথা সে শুনিয়া আসিতেছে। শ্বশুর শাশুড়ী পিসতুত মাসতুত ননদ ইত্যাদিতে এ বাড়ীখানি সরগরম ছিল কিন্তু আজ আর কেহ নাই। কেহ মরিয়াছে, কেহ শহরে রোজগারের উদ্দেশ্যে চলিয়া গিয়াছে, কেহ ম্যালেরিয়ায় এবং অজন্মায় গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীটির যৌবনবেলায় একটি প্রকাণ্ড পরিবার যে ইহাকে দলিত মথিত করিয়া জরাজীর্ণ অবস্থায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহার অনেক চিহ্নই বর্ত্তমান। উপরে উঠিবার সিঁড়িগুলা ক্ষয় হইয়া সমান হইয়া গিয়াছে, কুয়ার সুমুখে চাতালটার শুধু চিহ্নই আছে আর কিছুই নাই। বড় দালানটার যেখানে বছর বছর দুর্গা পূজা হইত, তাহাতে এমনি তিনচারিটা ফাটল ধরিয়াছে যে তাহার ভিতর দিয়া ঘোষপাড়া বারোয়ারীতলাটার সমস্তই দেখা যায়। এমনি আরও কত কি!

সকালবেলায় মনোরমা উঠিয়া ভাঙ্গা মাটীর কলসীটা করিয়া ডোবা হইতে জল বহিয়া আনিয়া প্রায় আধখানা বাড়ী ধুইয়া ফেলিল। ঘরের ভিতর দালানের খাজে খাজে অশথ গাছের চারা ও নানারূপ গাছ-গাছড়া গজাইয়াছিল, যতটা পারিল, সেগুলাকে তুলিয়া ফেলিয়া পরিষ্কার করিল। বাছিয়া বাছিয়া যে ঘরটা শুইবার জন্য তাহারা লইয়াছিল, তাহার উত্তর দিকের দেওয়ালের উপর কার্ণিশটা ধ্বসিয়া গিয়া ছাদের একখানা বরগা ঝুলিতেছিল, তাহা কখন্ পড়ে; তাহারই তলায় একরাশি সুরকি ও বালির চাপড়া জমা ছিল—সেগুলাকে সে তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিল। এইরূপে ধীরে ধীরে কোনও রূপে কায়ক্লেশে ঘরখানিকে সে বাসের উপযুক্ত করিয়া লইল।

তারপরে স্নান সারিয়া যখন সে মাথা মুছিতেছিল, একটা লোক অন্যমনস্ক ভাবে একখানা দা লইয়া সটান ভিতরে চলিয়া আসিতেছিল। মনোরমা মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া সুমুখে আসিয়া বিনয়কাতর কণ্ঠে বলিল, দয়া ক'রে আপনারা আর বাকী জানালা ক'টা কেটে নেবেন না, সবই ত পুড়িয়ে ফেলেছেন—

লোকটা থতমত খাইয়া গেল। জরাজীর্ণ গৃহখানির স্তব্ধ নির্জনতা অল্পমাত্র ভেদ করিতে পারিয়া নারী-কণ্ঠস্বর ভিজা তবলার মত ঢ্যাব ঢ্যাব করিয়া উঠিল। একটুমাত্র নীরব থাকিয়া লোকটা বলিল, আমরা ত এখান থেকে রোজই কাঠ কেটে নিয়ে যায় কেউ বারণ করে না, তুমি কে গা বাছা ?

মনোরমা সহসা উত্তর দিতে পারিল না, লোকটি পুনরায় বলিল,—তোমরা কি এখানে থাকতে এলে ?

—হ্যাঁ, কতদিন আর খালি পড়ে থাকবে, তাই এবার থাকতেই এলুম, কিন্তু আপনারা দয়া করে আর গরীবের কুঁড়েটুকুর বাঁধনগুলি কেটে নিয়ে যাবেন না, যদি কোনও দরকার থাকে ত শুধু হাতেই বাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন,—শেষের কথাগুলি সে জোর দিয়াই বলিয়া গেল।

লোকটি অবাক, তবুও একটু বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল,—একি তোমাদেরই বাড়ী ?

—হ্যাঁ।

—তবে এতদিন ছিলে কোথায় বাড়ী খালি রেখে ?

—যাক্‌গে সে আলোচনা পরেও হ'তে পারবে, আপনি এখন আসুন গে যান্ ; বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে রুগ্ন মেয়েটা ওয়াক্ ওয়াক্ করিতে করিতে সুমুখে আসিয়া পড়িয়া অনর্গল বমি করিতে লাগিল।

লোকটি আর কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

জল আনিয়া তাড়াতাড়ি মনোরমা মেয়েটার মুখে চোখে দিতে লাগিল। কতকটা সুস্থ হইলে দেয়ালে হেলান দিয়া মেয়েটা বসিয়া রহিল। ম্যালেরিয়ায় তাহার চেহারা বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে, মাথায় স্বল্প চুলের নুড়িটা বহুদিন তেলজল না পাইয়া একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, চোখের কোণের হাড় দুইটা খোঁচার মত ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিয়াছে, চোখ দুইটা তত পরিমাণেই ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে,—ঠাহর না করিলে আর দেখা যায় না।

ময়লা দাঁত দুপাটি অধরোষ্ঠকে ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কঙ্কালসার দেহটার রং হইয়া গিয়াছে হল্‌দে মত, তাহার উপর মাঝে মাঝে এক পরদা পুরু ময়লা পড়িয়াছে। কে বলিবে এ মায়ের এ মেয়ে! ঘরের ভিতর হইতে বিকৃত কণ্ঠে মন্মথ ডাকিলেন, শুনচ?

—দাঁড়াও যাচ্ছি,—বলিয়া মনোরমা দালানের এক কোণ হইতে এক বাটি সাগু সিদ্ধ আনিয়া বলিল, অনেকক্ষণ খাস্‌নি একটু খেয়ে ফেল বিম্‌লি—

বিমলা নাকে কাঁদিয়া উঠিল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, না খাব না, ফেলে দাওগে —বলিয়া সে পিছন ফিরিয়া বসিল।

ম্যালেরিয়া রোগী বিষ খাইতে চায়, কিন্তু সাগু খাইতে চায় না। সুতরাং কাছে বসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া মনোরমা বলিল,—খেয়ে ফেল লক্ষ্মী মা আমার, আর কিছু ত নেই!

মেয়ে তেমনি ভাবেই বলিল, রোজ সাবু, রোজ সাবু, যখন তখন সাবু, দুটি ভাত দিতে পার না কেন? বলিয়া অশ্রুসজল চক্ষে মায়ের পানে একবার চাহিয়া কম্পিত ক্ষীণ হস্তে বাটিটা লইয়া একটু একটু করিয়া খাইতে লাগিল।

মেয়ের তিরস্কারে মনোরমা চুপ করিয়া রহিল। তাহারই পেটের এমন একটা কুহকী সন্তান শেষ নিঃশ্বাসটি ফেলিবার পূর্ব্বে মরণার্ত্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া একদিন বলিয়াছিল—দুটি ভাত দিতে পার না কেন?—কিন্তু সে দুটি ভাত দিতে পারে নাই এবং তাহার দারিদ্র-নিপীড়িত মাতৃহৃদয়ের যে অব্যক্ত মর্মান্তিক জ্বালা সেদিন মরণোন্মুখ সন্তানের তিরস্কারে চুপ করিয়া গিয়াছিল, আজ তাহার চক্ষের সুমুখে যেন সেই ভয়ঙ্করী নিশীথিনীটি মূর্ত্ত হইয়া জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

মন্মথ ভিতর হইতে পুনরায় ডাকিলেন, শুনতে পাচ্ছ না, কানের মাথা খেলে?

যাই, বলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া চক্ষের জলের ফোঁটা দুইটা তাড়াতাড়ি

মুছিয়া ফেলিয়া সে ভিতরে গিয়া দেখিল, মন্মথ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, ঠোঁটের কস্ বাহিয়া রক্তের ধারাটি পড়িয়া জীর্ণ কাঁথাখানি ভিজিয়া গিয়াছে। এ আজ নতুন নয়, প্রায় ছয় সাত বছর হইল মন্মথ হাঁপানিতে ভুগিতেছেন। আগে কাশির সঙ্গে সর্দ্দি উঠিত, আজকাল রক্ত উঠে। আগে তিনি নিজেই নিজের সেবা করিতেন, আজকাল আর পারেন না, হাত পা অসাড় হইয়া গিয়াছে।

তাড়াতাড়ি মুখখানি মুছাইয়া মনোরমা আস্তে আস্তে আঁচল দিয়া মাছি তাড়াইতে লাগিল। মন্মথ ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, সেই বড়ি আছে একটা দাও, নইলে কম পড়বে না। মনোরমা ধীরে ধীরে উঠিয়া কুলুঙ্গীর উপর হইতে একটি কাপড়ের পুঁটলি খুলিয়া কাগজের কৌটা করা কতকগুলা বড়ি হইতে একটি বাহির করিয়া আনিল। কোলের ছেলেটা যখন মরে, তাহারই গলার শেষ সোনার মাদুলিটি বেচিয়া এই হাঁপানির ঔষধটি সে স্বামীর জন্য কিনিয়া দিয়াছিল। এমন হইলেও পূর্ব্বে তাহাদের অবস্থা ভালই ছিল। মন্মথ কোথায় রেলে বহুদিন চাকরী করিতেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের বধূটি একটি ছেলে রাখিয়া মারা যায়। ছেলেটি মামার বাড়ীতে থাকিয়া বড় হয়, ওদিকে ছন্নছাড়া পিতা মদ খাইয়া যথেচ্ছাচার করিতে শুরু করেন। ছেলে অনেকদিন এইরূপ সহ্য করিয়া বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে, ফলে বাপ তাহাকে 'ত্যজ্য পুত্র' করিয়া তাড়াইয়া দেন। কিছুদিন পরে দূরসম্পর্কীয় বোনের অনুরোধে মন্মথ দ্বিতীয় পক্ষে মনোরমাকে বিবাহ করেন। পরে মনোরমা শুনিয়াছিল, তাহার সতীনপোটি শহরে কোন্ ঠিকানায় থাকিয়া আফিসে চাকরী করিতেছে।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বাধা না মানিয়া মন্মথ দিন দিন মদের পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন। শেষে পরিমাণ—পরিণামে দাঁড়াই। হাঁপানি হইল। কবিরাজ বলিয়াছে, বেশী বয়সের অসুখ, এ আর সারবে না—

বড়ি খাওয়াইয়া মনোরমা বলিল, এবেলা খাবে কি?

কষ্টে ঘাড় তুলিয়া মন্মথ বলিলেন, খাবার কিছু জোগাড় আছে বুঝি?

—না নেই কিছু, কিন্তু খাওয়া ত দরকার ?

খাওয়া দরকার ? হ্যাঁ যে ক'টি চিঁড়ে ছিল তা আমি খেয়েছি, সাবুটুকুও বাপ বেটিতে খেয়েছি,—কিন্তু তুমি দুদিন কিছু খাওনি—খাওয়া দরকার এখন তোমারই—

মনোরমা বলিল, আমি দুদিন খাইনি, আমি মেয়েমানুষ, আমার এতখানি শরীর, অসুখের চিহ্নটি নেই—

—অসুখ থাকলেই ত ক্ষিধে থাকে না, কিন্তু সুস্থ শরীরেই যে খাওয়ার দরকারটি বেশী—বলিয়া মৃদু হাসিতে গিয়াই ভিতর হইতে একটা ভীষণ কাশির বেগে তিনি হাঁ করিয়া উঠিলেন। মনোরমা চলিয়া যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি আসিয়া স্বামীর বুকের দুইটা পাশ শক্ত করিয়া জাপটাইয়া ধরিল, পাছে কাশির চাড়ে কঙ্কালসার দেহের হাড় পাঁজড়াগুলি পাতলা মাংস ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে। একটানে দশবার কি পনেরবার কাশিয়া তবে একটু সুস্থ হইলে মনোরমা আস্তে আস্তে বাহিরে আসিল।

সাগুর বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বিমলা কখন যে বমি করিয়া ভাসাইয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই। আসিয়া দেখে সে দেয়ালে হেলান দিয়া ঝিমাইতেছে, সুমুখের কাপড়টা বমিতে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহাকে সুস্থ করিয়া ঘরে শোয়াইয়া দিয়া সে বাহিরে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে! মেয়েটার এই মরণাপন্ন অবস্থা, মন্মথরও তাই—যেদিন যায় সেই দিনই ভাল। রেলের পুরাতন কর্ম্মচারী বলিয়া মন্মথ কিছু মাসহারা পাইতেন, কিন্তু এমাসের প্রথমেই নানারূপে তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে। ঠিকানা সন্ধান করিয়া মনোরমা সতীনপোকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিল কিন্তু উত্তর আসে নাই।

বুকভাঙ্গা একটা দীর্ঘশ্বাস তপ্ত ঘূর্ণীবায়ুর মত তাহার বুক চিরিয়া বাহির হইয়া গেল। সুমুখের খিড়কী দরজার নিকটে একটা তালগাছের পাতার বাতাস লাগিয়া সিরসির করিতেছিল। তাহারই তলায় যে ঘরটায় তাহার শাশুড়ী থাকিতেন সেটার ছাদ ধ্বসিয়া গিয়াছে, ভিতরের সেই স্তূপীকৃত

আবর্জ্জনারাশির পাশে একটা কালো বিড়াল কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। তৃষ্ণায় মনোরমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গিয়া সে ডোবায় নামিয়া অঞ্জলি ভরিয়া খানিক জল খাইল, এবং আস্তে আস্তে মুখে ও মাথায় জলের হাত বুলাইতে লাগিল।

পড়ো বাড়ীটায় লোক আসিয়াছে এটা যখন সে অঞ্চলে রাষ্ট্র হইয়া গেল, তখন এ খবরটি সান্ধ্যসমিতিতে পৌছাইতে একটুও বিলম্ব হইল না। পাড়ার কতকগুলি যুবক লইয়া বছরখানেক পূর্ব্বে এই সান্ধ্যসমিতি ভূমিষ্ঠ হয়। খগেনবাবু এর হর্ত্তাকর্ত্তা। চাল, পয়সা যাহা কিছু লোকের নিকট হইতে আদায় হয় সবই তাঁহার বাড়ীতে গিয়া জমে। তাঁহার দুইটি ছেলে বেকার বসিয়াছিল, সমিতির চাঁদা আদায় করিয়া দেয় বলিয়া তিনি তাঁহাদের কিছু কিছু হাতখরচ দেন। চালগুলি গরীব দুঃখীদের ভিতর বিলি হয় কিনা এ খবর কেহ রাখেনা। কিছুদিন হইতে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে এখানে চার পাঁচটি চরকাও বসিয়াছে। চাঁদার পয়সা হইতে চরকা ও তুলা কেনা হয়; শুধু তাই নয়, গোটা কয়েক বেকার ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার হুজুক লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা যা সূতা কাটে তাহাই তাঁতীর বাড়ী বুনাইয়া লইয়া খগেনবাবুর পরিবারের কাপড়ের খরচ বাঁচিয়া যায়।

আজ সন্ধ্যাবেলা এখানে প্রবল তাসের আড্ডা বসিয়াছিল, রোজই বসে। মাঝে মাঝে ইহাদের সহর্ষ এবং সক্রোধ চীৎকার অনেক দূর অবধি শুনা যাইতেছিল। আশু ছেলেটা একটু ভালমানুষ, সরকারী হিসাবের অফিসে সে চাকরী করে। তাহাদের ডাকিয়া সে বলিল, ওহে রাত্তির হ'ল, তাসগুলো না ছিঁড়ে কি উঠবে না? তাহার কথা কেহ শুনিল না, শেষে সে আস্তে আস্তে হরিদাসের পকেট হইতে দুইটি বিড়ি তুলিয়া লইয়া একটি ধরাইল, আর একটি রাখিয়া দিল, রাত্রে দরকার লাগিবে। পরে বিড়ি টানিতে

টানিতে বলিল, ওহে জমিদার, মাইনে পেতে এখনও দেরী আছে, একটা টাকা ধার দাও-না—

জমিদার ওরফে মহিম মুখ ফিরাইয়া বলিল, টাকা কি হবে, ডেলি প্যাসেঞ্জারের টিকিট ত কেনাই আছে—

—তা বললে কি হয়, টিফিনের সময় পেটের ভেতরটা যে জ্বলেপুড়ে যায়, না খাই এক পয়সার সরবৎ, না খাই এক খিলি পান। আজ চারদিন ধরে পানউলি মাগির সুমুখ দিয়ে নাকে রুমাল বেঁধে আনাগোনা করছি, ধরতে পারলে চূণখয়ের মাখিয়ে ছেড়ে দেবে—দাও, দাও একটা টাকা, জমিদার মানুষ তোমরা, রাজা লোক,—টাকা একটা ছাড়—

মহিম মৃদু হাসিয়া বলিল, কেন, বাড়ী থেকে তুই হাতখরচ পাস্‌নে?

—হাঁ, হাতখরচ! আটতিরিশটা টাকা মাইনে পাই, তার মধ্যে তিন টাকা যায় মান্‌থলি টিকিটে, তারপর মাসকাবারি দেনা শোধ করে যখন বাড়ী যাই, তখন হাতে থাকে আড়াই টাকা—তারপর বাড়ীতে সারা মাসের খরচ, বল ত চাঁদ—কোত্থেকে হাতখরচ পাব?

ওধারে এতক্ষণ মুহুর্মুহু গর্জ্জন উঠিতেছিল, এক ছক্কা খাইতে দুইটি খেলোয়াড়ের মধ্যে বচসা শুরু হইয়াছিল। খানিক পরে গোল একটু থামিলে হরিদাস ধীরে সুস্থে একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল, ওহে জমিদার, তোমার চাঁদা কই? সাতমাস হ'ল যে—

মহিম হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, হাতে এখন পয়সা নেই ভাই, সত্যি বলছি।

তুমি জমিদার, তোমার হাতে পয়সা নেই? এ হ'তে পারে না!

বলাই ছেলেটা ঠোঁটকাটা। সে মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, বড়লোকের পয়সা না থাকা আজকাল ফ্যাশন—

খগেনবাবু প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ কিসে কি হইয়া গেল। সকলের হাতের জলন্ত বিড়িগুলা চট্ করিয়া হাতের চেটোর আড়ালে চলিয়া গেল। খগেনবাবুর বড়ছেলে ঘোঁতা এতক্ষণ অত্যন্ত আরামে বিড়িতে টান দিতেছিল,

একমুখ ধোঁয়া লইয়া সে আর ছাড়িতে পারিল না ; চোখমুখ রক্তবর্ণ করিয়া হঠাৎ জানালার ধারে উঠিয়া গেল। ছোট ছেলে প্যাতাই মাদুরের উপর তবলার বোল ফুটাইতেছিল, হঠাৎ একখানা হিসাবের খাতা টানিয়া উল্টা দিকেই পড়িতে লাগিয়া গেল। কৈলাস অনেকক্ষণ হইতে উবুড় হইয়া শুইয়া দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ বুজিয়া 'মোটি মোটি লিটিয়া' গান ধরিয়াছিল, খগেনবাবুর সাড়া পাইয়া ঝপ করিয়া তাহার গান থামিয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে উঠিয়া বলিল, বাইরে থেকে আসি—বলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

খগেনবাবু তাহার পথের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, ওর চাঁদা বাকি আছে বুঝি ?

হরিদাস বলিল, কৈলাসের ? হ্যাঁ, তিন মাসের বাকি—

খগেনবাবু মুখ রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, ছিঃ তোমরা ভদ্রলোকের ছেলে, কথার ঠিক রাখতে পার না। আর খাতা খুলে দেখ আমাদের দীনুমুচির বস্তির মেম্বারদের রেগুলারিটি—তারা এক মাসের আগাল দিয়ে রাখে—মহিম, তুমিও দাওনি তো ?

—দু' এক দিনের মধ্যে দিয়ে দেবো—

বলাই বলিল, আপনারও দু' মাসের বাকি খুড়োমশাই—

—ওঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, গেল কাল দেবার কথা ছিল বটে, আর পাঁচ ঝঞ্চাটে কি মনে থাকে বাপু ? আচ্ছা চাঁদার কথা থাক্, ওরে ও রহিম, ছোঁড়া গেল কোথায় ? এক ছিলিম তামাক দে হতভাগা—

প্যাতাই বা পর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, হঠাৎ বলিল, কালই বা দেবে কোত্থেকে বাবা ? পয়সার জন্যে ত কাল—

—আঃ আমি দেখি, ছোঁড়া কোথায় গেল, বলিয়া বাহিরে আসিয়া খগেনবাবু বলিতে লাগিলেন, এই যে এখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছে, বেটা কেবল দিন রাত পড়ে পড়ে ঘুমুবে, তামাক সাজ হতভাগা। বলিয়া পুনরায় ভিতরে আসিয়া বলিলেন, এই প্যাতাই, ওরে ওই ঘোঁতা, ঢুলচিস্—যা বাড়ী যা—

দিন রাত ইয়ারকি মারবে—কাল থেকে প্যাতাই আর ক্লাবে আসবিনে, না পড়া না শুনো—যা বেরো। তাহারা বাহির হইয়া গেল।

হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য খগেনবাবু রহিমকে এখানকার চাকর রাখিয়াছেন। বছর ষোল তার বয়স, সে 'ক্লাবরুম' প্রত্যহ পরিষ্কার করে, আলো জ্বালে, তামাক সাজে। দিনের বেলা খগেনবাবুর বাড়ীতে খায়, রাত্রিতে এখানে পড়িয়া থাকে। মাহিনা মাসে এক টাকা। তাহার সমস্ত খরচ, কাপড়-চোপড় বাদ—সমিতি বহন করে, কিন্তু তাহার মাহিনার টাকাটি খগেনবাবুর নিকট জমিয়া বোধ করি, এতদিন বিশ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মাহিনা চাহিলেই খগেনবাবু বলেন, কি চাই বল না, কিনে এনে দেবো—। সে কিছু বলে না, হাসিয়া সরিয়া যায়।

রহিম আসিয়া তামাক সাজিতে বসিয়া গেল। খগেনবাবু একবার কাশিয়া লইয়া বলিলেন, পোড়ো বাড়ীটায় লোক এসেছে শুনেছ ত?

সকলে বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ- মহিম দেখে এসেছে—

—শুধু তাই নয়, শোন বলি, আমি কাল সকালেও বাড়ীতে কেউ নেই বলেই ঢুকছিলুম, একটা সোন্দরপানা মেয়ে আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিলে—

'সোন্দরপনা' মেয়েটিকে মহিম চকিতের ন্যায় দেখিতে পাইয়াছিল, তাই সবিস্ময়ে বলিল, আপনি গিছলেন কেন খুড়োমশাই?

—কেন, লোক বেড়াতে যায় না?

হরিদাস কহিল, ওদের সমিতির 'মেম্বর' করে নিলে হয় না?

খগেনবাবু উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, সেইজন্যই ত গিছলুম, আমার পোড়া কপাল। ওরে ও রহিম, তুই কাল যাবি—

রহিম মুখ ফিরাইল।

—গিয়ে বলবি, এ গ্রামে থাকতে হ'লে সমিতির মেম্বর হতে হবে—গরীব বলে ছেড়ে দেওয়া হবে না—বুঝলি?

রহিম তামাকের হুঁকাটা হাতে দিয়া বলিল, সে কি কথা কর্ত্তা, তারা যে বড্ড গরীব—

হুঁকায় একটা টান দিয়া খগেনবাবু চক্ষু পাকাইয়া বলিলেন, তুই থাম হতভাগা, ছোট মুখে বড় কথা, ফোপল্ দালালি করলে তাড়িয়ে দেবো—

মহিম আস্তে আস্তে বলিল, তারা গরীব, তুই কি করে জান্‌লি ?

রহিম উৎসাহ পাইয়া বলিল, তারা খুব গরীব জমিদারবাবু, খেতেও পায় না, আমি যে তেনাদের বাড়ী আজ গিছলুম—

—কেন গিছলি ?

—হোই সেথায় পুকুর ধারে বসে 'সেই দিদি' কাঁদ্‌ছিল, আমি যেতেই বলে, মেয়ের ম্যালোয়ারি হইছে ; আমার চাচা দাবাই জানে কিনা, তাই দিয়ে এনু।—সকলে নীরব। খগেনবাবু মুখে একটা শব্দ করিয়া বলিলেন, বেটা দাতাকর্ণ এসেছে ! রহিম আর কিছু বলিল না, বাহিরে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। উপরে আকাশটা তারায় ছাইয়া গিয়াছে, তাহাদেরই গায়ে কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদের একটু ঘোলাটে আভা পড়িয়াছে। সম্মুখে ঐ মাঠটার ওপাশে কয়েকটা দেবদারু গাছ বাতাসের দোলনায় অন্ধকারের অস্পষ্টতায় ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতেছিল। রহিম মেটে দেয়ালটায় হেলান দিয়া তন্দ্রালু দৃষ্টিতে বসিয়া রহিল। মানব-লোকের চিরন্তন অভাবের ব্যাথাটুকু তাহার মুখে লাগিয়াই রহিল।

কতক্ষণ বাদে গায়ে একটা আঙ্গুলের টিপ পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল, মুখ তুলিয়া বলিল, কে জমিদারবাবু—কি বলচ ?

মহিম বলিল, তুই এখানে বসে আছিস, কেউ দেখতে পায়নি, রাত হয়েছে, সকলে দোরে চাবি দিয়ে গেছে—

—তুমি যাওনি ?

—না, বলিয়া রহিম একটু থামিল। সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, নিকটে দূরে কেহ নাই, অন্ধকার রাত্রিতে ঝিল্লীর আর্ত্তনাদ ভেদ করিয়া চুবড়ি-পোতার চটকল হইতে ঘড়ির অস্পষ্ট ঢং ঢং শব্দ কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেছিল। মহিম সেই দিকে একবার চাহিয়া চট্ করিয়া বলিল,—তুই আর যাবিনে সেখানে, রহিম ?

—কোথায় বাবু ?

—সেই তোর দিদির বাড়ী ?

—ওঃ হ্যাঁ—কাল আবার যাব দাদাবাবু—

আজই চল্‌না, হয়ত তারা উপোস করে আছে, চল রহিম, তোর পুণ্যি হবে—

রহিম আবার তেমনি করিয়া হাসিল, বলিল, তা উপোস করেই আছে বাবু—তারা কিছু খেতে পায়নি—কিন্তু এই রাতে গিয়ে কি করতি পারব তাই ভাবচি—

—তা হক্‌, চল্‌ না দেখি—তুই বললি তাদের আবার অসুখ, গরীব লোকের অসুখ হলে, খেতে না পেলে কি দেখা উচিত নয়, রহিম ?

রহিম মৃদু হাসিয়া বলিল, চল যাই—উঃ কি মশা এখানে বাবু, এই পচা খানা, নৰ্দ্দমা পাঁকে ভৰ্ত্তি হয়ে রয়েছে—বলিয়া নিজের হাত পা চুলকাইতে চুলকাইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—আমার গায়ের চাদরটা নিবি ?—একটু একটু শীত পড়েছে—

—নাঃ, মশায় যে কামড় দিয়েছে, গায়ে জ্বালা ধরে গেছে—বলিয়া শুধু গায়েই সে চলিতে লাগিল।

ভিতরে ঢুকিতে বাধা নাই। বড় দেউড়ীর পাল্লা দুইটা কবে কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। সুমুখ দিকে মহিমের কিছুই নজর পড়িল না, কেবল একটা শেয়াল অন্ধকারে আসিয়া যে দরজাটার ফাঁক দিয়া আলোর রেখা দেখা যাইতেছিল, সেইখানে এদিকে ওদিকে উঁকি মারিতেছিল, ইহাদের দেখিয়া পলাইয়া গেল।

রহিম সেইদিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল, ওই ঘরে দিদি আছে, ডাকব বাবু ?

মহিম থতমত খাইয়া গেল। তাহার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করিতেছিল। ভয়ে নয়, মানুষের একটা স্বাভাবিক দুৰ্ব্বলতায়। সে যে ঠিক এই অন্ধকার রাত্রে অসময়ে পরের সাহায্য করিবে বলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে

তাহাই ভাবিয়া একটা আত্ম-অবিশ্বাসের অজ্ঞাত শিহরণে থমকাইয়া দাঁড়াইল।

রহিম তাহার মুখের অবস্থা অন্ধকারে লক্ষ্য করিতে পারিল না, পুনরায় বলিল, বাবু ডাকব? কিন্তু ডাকিতে হইল না। বদ্ধ দরজাটি খুট্ করিয়া খুলিয়া গেল। একটি মিটমিটে কেরোসিনের ডিবে ও একহাতে একখানা ময়লা কাঁথা লইয়া মনোরমা বাহির হইতেছিল। রহিম সেইখান হইতে ডাকিল, দিদি?

—কে রে—বলিয়া মনোরমা কাঁথাখানা ফেলিয়া আলোটা তুলিয়া ধরিল। মহিম স্পষ্ট দেখিল, দুইটি চোখে জলের ধারা চকচক করিতেছে। কাল একবার সে ইহাকে দেখিয়াছিল, আজ ভাল করিয়া দেখিল, মুখখানি মাধুর্যময়, বয়স আন্দাজ তেইশ কি চব্বিশ হইবে।

—আমি, বলিয়া রহিম অগ্রসর হইয়া গেল।

গাঢ়স্বরে মনোরমা বলিল, এত রাতে আবার কেন এসেছ ভাই, বলিয়া হাত দিয়া চোখের জলটা মুছিয়া বলিল, তোমার জামাইবাবুকে বোধ হয় আর বাঁচাতে পারলুম না রহিম—বলিতে বলিতে সে আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রহিম তাড়াতাড়ি বলিল, আমার সঙ্গে ইনি এসেছেন দিদি- ডাক্তার আনবেন কি? এঁরা খুব বড় লোক, পয়সা নেবেন না—

—কে এসেছেন? বলিয়া বিস্মিতভাবে মনোরমা মাথার কাপড়টা ঈষৎ টানিয়া দিল।

মহিম এইবার সরিয়া আসিয়া বলিল, আপনি রুগী নিয়ে দুদিন রয়েছেন, আমাদের খবর দেননি কেন, আমরা ডাক্তার পাঠিয়ে দিতুম—

মাথা নীচু করিয়া মনোরমা বলিল, আমরা ত আপনাদের চিনিনা, আপনারাও চেনেন না, সুতরাং—

মহিম বলিল, কিন্তু বিপদের সময় চিনিনা বলে অভিমান করা ত সাজে না, মানুষের ওপর মানুষের চিরকালের দাবীটুকু ত আছে। শোন্ রহিম—

তুই চট্ করে আমাদের বাড়ী গিয়ে সতীশ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়, বারটা বাজেনি—এখনও আমাদের বৈঠকখানায় তিনি বসে আছেন—যা। রহিম ঘাড় নাড়িয়া দ্রুত পদে চলিয়া গেল।

মহিম একটু থামিয়া বলিল, আপনারা কোথায় ছিলেন?

—বহরমপুরের একটা গ্রামে—

—ওঃ পাগলার দেশ—ম্যালেরিয়ার আড্ডা, আপনার স্বামীর ম্যালেরিয়া ত?

—না, হাঁপানি, ম্যালেরিয়ায় আমার মেয়েটি ভুগছে—

—আপনার মেয়ে! ওঃ তা ডাক্তার সারিয়ে দেবে—চলুন আপনার রুগীদের দেখি—বলিয়া—অলক্ষ্যে একবার তাহার দিকে চাহিয়া মাথা নীচু করিয়া মহিম ঘরের ভিতর ঢুকিল।

চক্ষের অশ্রু আর বাধা মানিল না, ভিতর হইতে সে যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল। রোগী মরিতে বসিয়াছে সে ত বটেই, কিন্তু আজ বিশ্বের সমস্ত করুণাটুকু হাতে করিয়া এক অনাথিনীকে যে এই যুবকটি ঘোর নিশারাতে কেবল শুধু সাহায্য করিতেই ছুটিয়া আসিয়াছে, ইহারই জন্যে মনে মনে মনোরমা বারংবার ঈশ্বরকে প্রণাম করিল এবং অপলক দৃষ্টিতে একবার যুবকটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বুঝিল, ইহারা তাহাদেরই একজন, যাহারা চিরদিন গরীব-দুঃখীদের আলেয়ার আলো দেখাইতে পারে।

একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর, ততোধিক জীর্ণ একখানা কাঁথাতে মন্মথ শুইয়া টানিয়া টানিয়া নিশ্বাস লইতেছিল। মহিম তাহারই এক পাশে গিয়া বসিল। ঘরের আসবাবের মধ্যে একটা টিনের বাক্স, দুই তিনটা বোতল, একটি লাঠি, একটা পোড়া কলাইয়ের বাটি, আর কিছু নাই। ওধারে একখানা ময়লা লেপের উপর বিমলা চোখ বুজিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়াছিল। কেরোসিনের ডিবের শিস্ উঠিয়া এবং ভিজা মাটির দুর্গন্ধে ঘরটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

চুপ করিয়া থাকা যায় না। মহিম বলিল, আপনাদের রান্নাবাড়াও হচ্ছে না বোধ হয়?

—হয়েছে, ওই রহিম কোত্থেকে পয়সা দিয়ে চাল ডাল এনে দিয়েছিল—ছেলেটি বড় ভাল, মুসলমান বলেই সেইজন্যে—। আমার অভাবের ব্যথা রহিমই প্রথমে বুঝেছিল। কাল একটি লোক এসেছিলেন, কিন্তু তিনি—

মহিম বলিল, হ্যাঁ—তিনি আমাদের সমিতির খগেনবাবু, তাঁকে নাকি আপনি অপমান করেচেন?

আমি? বলিয়া কাতর ম্লান চক্ষু দুইটি মনোরমা মহিমের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, আমার এই অবস্থায় লোককে অপমান করেছি?

মহিম সেই দৃষ্টিতে ব্যাথা পাইল। সলজ্জ ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, স্বার্থপর লোকের স্বার্থে আঘাত লাগলে হয়ত অপমানই বোধ করে, তা করুক; কিন্তু আপনি ত জানেন চোখ ফুটিয়ে দেওয়াটাই অপমান করা নয়।

বাহিরে রহিম ডাকিল, দিদি, ডাক্তারবাবু এসেছেন—

এইটুকু আমার সান্ত্বনা—বলিয়া মনোরমা আলোটা লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল।

ডাক্তার আসিয়া রোগী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহিম বলিল, কি রকম দেখচেন, সতীশবাবু?

খুব বেড়ে গেছে,—

মনোরমা বলিল, আজ বিকেল থেকে আর সহ্য করতে পাচ্চেন না, দয়া করে একটু ভাল ওষুধ দেবেন—

মহিম বলিল, ভাল ওষুধই দেবেন, কেননা আপনার আর্থিক অবস্থা ভাল হলে উনি নিশ্চয় রোগী হাতে রেখে চিকিৎসা করতেন—

বিমলাকে একবার নাড়াচাড়া করিয়া ডাক্তার বলিলেন, এ ত ম্যালেরিয়া দেখতে পাচ্ছি—বলিয়া মহিমকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিলে মহিম বলিল, রোগটা হাঁপানি ত?

হ্যাঁ, কিন্তু অবস্থা বড় সুবিধা নয়,—

মনোরমা আলো হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহিম বলিল, আজকে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই, আপনি রোগীর কাছে বসুনগে—

ওষুধ দেবেন না ?

না, আজ ওষুধের দরকার নেই, কাল ওষুধ নিয়ে আমি নিজেই আসব—বলিয়া মহিম এক পা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আর যা যা দরকার, আমি কাল পাঠিয়ে দেবো—আর রহিম, তুই এখানে থাক্—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

অর্দ্ধচেতন দেহে মনোরমা বলিল, ঘরের ভেতরে এস ভাই রহিম—ডাক্তার কি বললেন ?

সেরে যাবে বললে দিদি—বলিয়া রহিম আস্তে আস্তে ঘরে উঠিয়া আসিল।

ঔষধ খাইয়া রোগী একভাবেই রহিল, কিন্তু সেদিন বৈকালে আরও বাড়িয়া গেল। জেলা শহর হইতে সকাল বেলা মহিম বড় ডাক্তার আনিয়াছিল। তিনিও ওই কথা বলিয়া গেলেন, অবস্থা ভাল নয়। বিমলাও ভাল নাই, আগে উঠিতে বসিতে পারিত, এখন শুইয়াই থাকে। পেটের পিলেটা বড় হইয়া পেটটা ধামার মতন হইয়া উঠিয়াছে, কখন ফাটে। মনোরমা নিরুপায় হইয়া বলিল, কি হবে মহিমবাবু ?

মহিম বলিল, আপনার কি ইচ্ছে বলুন, আমি এখুনি করতে প্রস্তুত আছি।

আড়ালে গিয়া মনোরমা শুধু কাঁদিতে লাগিল।

রহিম সজলকণ্ঠে বলিল, এমন ডাক্তার কি নেই দাদাবাবু যে ভাল করতে পারে ?

মহিম এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, সে হচ্ছে ভগবান, আর কেউ নয়।

রহিম চুপ করিয়া সরিয়া গেল।

মহিম দুই দিন বাড়ী যায় নাই, চাকর ডাকিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় একটু বাহির হইলেই সান্ধ্যসমিতির ছেলেরা তামাসা করে। মহিম

প্রতিবাদ করিয়া কিছু বলিতেও পারে না, কাহারও সহিত দেখা হইলে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠে।

আজ মহিমের বাড়ী থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু একবারটি গিয়া চারটি ভাত খাইয়া আসিয়াছে, আর যায় নাই। তারপর এখানে আসিয়া রোগীর পাশের অপ্রশস্ত অতি জীর্ণ ঘরখানায় বাড়ীর চাকর দিয়া একটা বিছানা আনিয়া পাতিয়াছে। সন্ধ্যার পর মনোরমা বলিল, কই আপনি গেলেন না, যাবেন বলেছিলেন ?

মহিম বলিল, চলে যাওয়াটাই কি এত জরুরী, আর আপনার বিপদের অবস্থাটা কি এতই তুচ্ছ ? অবশ্য আমায় যেতে বল্‌লেই—

—ছিঃ ওকথা বলবেন না, আপনার এ উপকারের দাম আমি জীবনেও শোধ করতে পারব না। কিন্তু এ ঘরে আপনি কি থাকতে পারবেন ? বলিয়া ঘরখানার ভিতর একবার উঁকি দিয়া বলিল, বড় লোকের চিহ্নটুকু কিন্তু আছেই !

সবিস্ময়ে মহিম বলিল, কি রকম ?

ঐ বিছানাটি, পরিষ্কার ধপধপে—ওই যা বিম্‌লি বুঝি বমি করছে—বলিয়া মনোরমা আপনার ঘরে চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে আবার বাহিরে আসিয়া মনোরমা বলিল, এবেলা কি খাবেন ?

মহিম বলিল, বেলা আর নেই, রাত পুইয়ে এলো—

রান্নাবান্না ত করিনি—

সে কথা আমিও জানি, আর তার উপায়ও করে রেখেছি, এখন যদি অনুগ্রহ করে—

অনুগ্রহ ! কি করেচেন ?

আমি বাড়ী থেকে খাবার আনিয়েছি, কিন্তু আপনি কি খাবেন ? আমরা দু'জনেই স্বজাতি এবং পর ভাবিনে বলেই একথা বললুম।

একটা প্যাঁচা হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল, তারপর সব নীরব। সম্মুখে দূরে

জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। মনোরমার শিথিল দৃষ্টি যেন চিরকালের জন্য অবসর চাহিল, সম্মুখের অনন্ত পৃথিবী যেন মরণের মহাক্লান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িতেছিল, এবং তাহারও অন্তর জলপ্লাবনের তরঙ্গরাশির ন্যায় ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া উন্মত্ত আকর্ষণে টানিতেছিল। সে মাথা হেঁট করিল।

মহিম একটু হাসিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, আপনার ইচ্ছে নেই বুঝি?

আপনি খান্, বলিয়া মনোরমা ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে সে উঠিল কিন্তু খাইল না, আহারে রুচি চলিয়া গিয়াছে। আশপাশের আবর্জ্জনা এবং মাটির অসহ্য দুর্গন্ধে তাহার মাথার যন্ত্রণা হইতেছিল। পরণের কাপড়খানায় বিমলা বমি করিয়া দিয়াছে, তাহাতেও দুর্গন্ধ। কিন্তু আপাতঃ প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই দেখিয়া সে ডিবেটা চৌকাঠে রাখিয়া আসিয়া একটা ঢিপির উপর বসিয়া পড়িল। কতক্ষণ জানি না, বোধহয় অনেকক্ষণ হইবে, সেইখানেই বসিয়া রহিল। সহসা পিছন হইতে সম্মুখে আসিয়া মাথা হেলাইয়া মহিম বলিল, আপনি এখানে বসে যে?

মনোরমা চমকিয়া উঠিল, বলিল, আপনি এখনও ঘুমোননি বুঝি?

না, একি, আপনি কাঁদচেন কেন? আলোতে সে মনোরমার মুখখানি লক্ষ্য করিতেছিল।

মনোরমা বলিল, আমার আর কেউ নাই মহিমবাবু!

মহিম বলিল, একজনের কেউ নেই, এ হতে পারে না!

মুখ তুলিয়া মনোরমা চাহিল। জলে তাহার চোখ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্বেও সে স্বল্প আলোকে দেখিতে পাইল শুধু দুইটা চক্ষু, আর কিছু না। ওই উজ্জ্বল চক্ষু দুইটার দৃষ্টি যেন তাহার দেহের আবরণটা ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়া অন্তরলোকের সন্ধান করিতেছে। মনোরমা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল—শুষ্ক কঠিন কণ্ঠে বলিল, আপনি কাল্‌ত নিশ্চয় যাবেন?

হ্যাঁ কালই যাব, আপনার কিছু—?

বেশ, আপনার উপকার আমি ভুলব না। তবে আজ শুয়ে পড়ুনগে—

ইত্যাদি দু' একটি অসংবদ্ধ কথা বলিতে বলিতে সে তাড়াতাড়ি আলোটা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দুয়ারের খিলটা আঁটিয়া দিল।

বিপদ কিন্তু আরও ঘনাইয়া আসিল। মন্মথর হাঁপানির টান আরও বাড়িয়া গিয়া 'শ্বাসে' পরিণত হইল; মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না, চোখ দুইটা ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে, পা ফুলিয়াছে। বিমলার অবস্থাও তদ্রূপ, সারাদিন চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। কখনও ক্ষীণ কণ্ঠে কাঁদিয়া বলে, দুটি ভাত দিতে পার না মা?

মা বলে, অসুখ সেরে গেলে ভাত দেবো, মা—ডাক্তার বারণ করেছেন—। বিমলা চুপ করে, পাণ্ডুর চোখ দুইটা দিয়া জ লর ফোঁটা কাঁথায় পড়ে।

বৈকালে মহিম আসিল। মনোরমা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল, কাল আমি যদি কোনও দোষ করে থাকি তবে মাপ করবেন!

মহিম বিস্মিত হইয়া বলিল, কই আমার ত মনে পড়ে না যে আপনি দোষ করেছেন—?

মনোরমা সেখান হইতে সরিয়া গিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, রহিম কাল থেকে আসেনি কেন?

সে এখানে আসে বলে খগেনবাবু তাকে মেরেছেন, হাতটা বোধহয় তার ভেঙ্গেই গিয়েছে।

শুনিয়া মনোরমা শিহরিয়া উঠিল, অস্ফুট স্বরে বলিল, হাত ভেঙ্গে দিয়েছে? কেন, আমি কি এতই ঘৃণার পাত্রী? আপনিও তবে আর আসবেন না, মহিমবাবু।

ছিঃ ওকথা বলবেন না, আর যার কাছেই হোক, আমার কাছে আপনি ঘৃণার পাত্রী নন্ মোটেই!

মনোরমা সজল চক্ষে সরিয়া গেল। রহিমের ব্যাথাটা তাহার বড় বাজিয়াছিল।

সে-রাত্রি আর কাটে না। নিঃশব্দে অন্ধকারের ভয়ার্ত্ত বিভীষিকা লইয়া মৃত্যু সেদিন এই ভগ্ন জীর্ণ গৃহখানিকে অধিকার করিয়া রহিল। মিটমিটে আলোকে তাহার সে মূর্ত্তি আরও ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। মহিম চলিয়া গিয়াছে, সকাল না হইলে আর আসিবে না। মনোরমা কাত হইয়া বিছানার এক ধারে একখানা হাত মন্মথর গায়ের উপর রাখিয়া বসিয়া রহিল। তাহার সে দৃষ্টিতে আর কিছু ছিল না, সারা সংসারটা যেন চেতনাহীন শিথিলতায় আপনার বাঁধটি আল্‌গা করিয়া সম্মুখে ধীরে ধীরে লুটাইয়া পড়িতেছিল এবং তাহার এই তন্দ্রালু দৃষ্টির অন্তরালে সঙ্গোপনে মৃত্যু তাহার ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া কখন যে মন্মথর প্রাণটুকু চুরি করিয়া লইল তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

সকাল বেলায় মহিম আসিয়া চার পাঁচটি লোক দ্বারা শবের সংকার করিতে পাঠাইল। সে নিজে গেল না। মনোরমা বলিল, আমাকেও যেতে হবে কি?

মহিম বলিল, সেখানে যাওয়া দুরূহ, আপনার কোন চিন্তা নেই, ওরা নির্ব্বিঘ্নে কাজ শেষ করে ফিরে আসবে।

মনোরমা চুপ করিয়া চলিয়া গেল। চোখে তাহার অশ্রু নাই, থাকিলে প্লাবন বহিয়া যাইত।

বিমলা মায়ের দুঃখে কাঁদিবার চেষ্টা করিল, পারিল না; বিকৃত মুখে পাশ ফিরিয়া পড়িয়া রহিল।

অনেক বেলায় ডোবার ধারে বসিয়া মনোরমা মাথার সিঁদুর মুছিল, হাতের কাচের চুড়ি ভাঙ্গিল, লোহা খুলিল, তারপর স্নান করিয়া শুচি হইল।

দিন চারেক পরে রহিম আসিল। দিদির অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মনোরমা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, কেঁদে কি হবে ভাই, আমি জানি এ দুঃখ আমার সইতে হবে, এর জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলুম, বলিয়া সে রহিমের কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া বলিল, কিন্তু আমার জন্যে তোমাকেও যে এই ভাঙ্গা হাতের ব্যথা সইতে হচ্ছে রহিম, এর সান্ত্বনা ত আর আমি খুঁজে পাচ্ছিনে ভাই।

রহিম এত কথা সব বুঝিতে পারিল না বটে তবে এ স্নেহের স্পর্শে ভুলিয়া গেল, বলিল, তুমি আমায় ভালবাস দিদি ?

তা কি তোমার বিশ্বাস হয় না রহিম, মুসলমান বলে কি তুমি আমার ভাই নও ?

রহিম মাথা নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তার জন্যে নয় দিদি, আমরাও যে গরীব !

ভিতর হইতে বিমলা ক্ষীণ কণ্ঠে মা মা বলিয়া ডাকিল। মনোরমা তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া বলিল, এই যে মা দুধ গরম করে দিই, বলিয়া বাটিটা আগুনের উপর বসাইয়া দিল।

মেয়েকে দুধ খাওয়াইয়া যখন বাহিরে আসিল, দেখিল হাতের উপর মাথার ভর দিয়া মহিম চুপ করিয়া বসিয়া আছে। পিছন হইতে মনোরমা বলিল, রহিম কই ?

তাকে যেতে বললুম, নয় ত বেটা আবার হয়ত মার খেয়ে মরবে, বলিয়া মহিম একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

তা বেশ করেচেন, আপনিও এবার যাচ্ছেন বোধ হয়। তা যান, আব থেকেই বা আপনার লাভ কি !

মহিম চাহিল, আবার সেই দৃষ্টি, কিন্তু এবার মনোরমা তাহা দেখিতে পাইল না, দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল। মহিম বলিল, লাভ ? আমি কি লাভের জন্যেই ছিলুম ?

না তা নয়, রুগী বাঁচলে আপনার পরিশ্রমের পুরস্কার হত। যারা সেবা করে তাদের সেইটুকুই লাভ। কিন্তু আপনার এ উপকার আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

কথার মধ্যে জড়তা বা দ্বিধার লেশমাত্র নাই। মহিম বিস্মিত হইল, পূর্ব্বে তাহার সকল কথাবার্ত্তার আড়ালে একটু কৃতজ্ঞতা থাকিত, কিন্তু ইহাতে তাহাও নাই। সে মুহূর্তমাত্র ভাবিল তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, কিন্তু পরিশ্রমের পুরস্কার ত আছে, সেটা চাইলে ত পাপ নেই।

হঠাৎ মনোরমা মুখ ফিরাইল, তারপর বলিল, আপনি কি স্পষ্ট কথা বলতে জানেন না, মহিমবাবু? আপনার অভাব কিসের যে আপনি পুরস্কার চাইছেন? তা ছাড়া আমার আছেই বা কি যে দেবো?

মহিম একটু হাসিল, হাসিয়া বলিল, দেবার মত কিছু কি নেই? এবং আরও কিছু বলিতে গিয়া সহসা মনোরমার মুখের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের দিকে চাহিয়া ঘাড় হেঁট করিল।

কি বললেন? ওঃ বুঝতে পেরেছি আপনার কথা!

মহিম বিবর্ণ মুখে চাহিল।

শোন মহিম, তুমি যেদিন রাত্রের অন্ধকারে আমার সুমুখে এসেছিলে, আমি তখন তোমার মুখের দীপ্তিটুকু দেখে ভাবলুম, তুমি দেবতা, কিন্তু আজ বুঝেছি তুমিও মানুষ, রক্ত মাংসের তৈরী তুমি। আজ বুঝতে পাচ্ছি, তোমার মুখে সেইটুকু আগুনের ফুল্‌কি ছিল। উপকারের কথা বলছিলে? জগতের ওপর আমারও যে ক্ষুদ্র অধিকারটুকু আছে তারই জোরে আমি তোমার কাছে সাহায্য নিয়েছি, কিন্তু সে বাঁধনটুকু তুমি আজ নিজেই কাটলে ভাই, বলিতে বলিতে অধীর আবেগে মনোরমার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল।

মহিম বজ্রাহত হইয়া মাথা নীচু করিল। এত বড় আঘাত সে জীবনে পায় নাই। সহসা বিদ্যুৎ শিহরণ তাহাকে অবশ করিয়া ফেলিল। সে টলিতে টলিতে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরদিন আবার সে আসিল। মনোরমা হবিষান্ন চড়াইতেছিল, তাহার সুমুখে আসিয়া বলিল, আমায় মাপ করুণ, আমি ভুল বুঝতে পেরেছি।

ম্লান হাসিয়া মনোরমা বলিল, তোমার সকল দোষ যে আমায় মাপ করতে হবে ভাই, তোমার উপকার যে আমি জীবনে ভুলতে পারব না!

মহিম দাঁড়াইতে পারিল না, চলিয়া যাইতেছিল, মুখ বাড়াইয়া মনোরমা

বলিল, তোমার টাকা কটা আর বিছানা চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি, পেয়েছ বোধ হয় ?

হ্যাঁ।

সেদিন সান্ধ্য সমিতির আখড়ায় খগেনবাবু বলিলেন, সব শুন্‌লে ত ?

সকলে বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ ?

এমন মিটমিটে ডান তা ত জানতুম না। সাতমাসের চাঁদা বাকি আর ওদিকে দান ছত্তর খুলে বিধবা ছুঁড়িটাকে নিয়ে কী বেলেল্লা গিরিই করছে, জমিদারের বেটা কি না—তার জন্যেই ত রহিম ছোঁড়া মার খেয়ে ম'ল, সেই পথ দেখালে।

বলাই রাগিয়া গিয়াছিল, বলিল, তার হাডটা কি ভেঙ্গে গেছে, খুড়ো মশাই !

কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া খগেনবাবু বলিলেন, তুমি বোঝ না বলু, ও মুসলমানের হাড়, আবার ঠিক জোড়া লাগবে। কই হতভাগা গেল কোথায় ?

রহিম বাহিরে অন্ধকারেই চেটাইয়ের উপর 'বার-বাঁধা' বাঁ হাতটা ধরিয়া বসিয়াছিল, আস্তে আস্তে উঠিয়া ভিতরে আসিল। চোখের জল সে যে এইমাত্র মুছিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যায়।

আর তাদের বাড়ী যাবি হতভাগা ? এত চেষ্টা করি হিন্দু মুসলমানের মেলবার জন্যে, কিন্তু তা কি তোমাদের পাষণ্ডদের জ্বালায় হবার যো আছে ? হুঁঃ, বলিয়া তিনি হুঁকায় একটা জোরে টান দিয়া উপর দিকে ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় বলিলেন, কেন তুই অমন নষ্টামি করতে গেলি ? মেরে বসলুম। হাতের যন্ত্রণা হচ্ছে খুব ?

চোখের জল আর রহিমের বাধা মানিল না। কিন্তু তাহা অতি কষ্টে রোধ করিয়া না বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া এক হাতে মুখখানা ঢাকিয়া সে অন্ধকারে বসিয়া পড়িল। তাহার এ অশ্রু শুধু যে হাতের বেদনার জন্যই তাহা

নয়, কিন্তু প্রহারের ঘায়ে হাত ভাঙ্গা সত্ত্বেও যে তাহার 'দিদির' বৈধব্যটুকু রদ হইল না, এ অশ্রু সে কারণেও।

মেয়েটাও বাঁচিল না। লিভার পিলেতে হল্‌দে হইয়া, দম্ আটকাইয়া একদিন দুপুর বেলায় তাহার শেষ হইয়া গেল। সাহায্য করিবার আর কেহ ছিল না, শুধু রহিম অদূরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। মনোরমা তাহার দিকে একবার চাহিয়া ছেঁড়া কাঁথাবালিশ মাদুর সুদ্ধ মৃত দেহটাকে তুলিয়া বাহিরে আনিয়া ফেলিল। একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ স্বর যেন মৃত দেহটাকে ভেদ করিয়া কেবলই তাহার কানে কঠিন হইয়া বাজিতে লাগিল, 'দুটি ভাত দিতে পার না মা ?'

নির্জ্জন দুপুরের রৌদ্রটা জনশূন্য ভগ্ন পুরীর মধ্যে খাঁ খাঁ করিতেছিল। সুমুখের ভিজা পাঁচিলের উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া তাহা হইতে এক প্রকার ধোঁয়া বাহির হইতেছিল।

কি হবে রহিম ?

রহিম চোখ মুছিয়া বলিল, আমি এখনি উপায় করে দিচ্ছি দিদি।

একদৃষ্টে মৃত কঙ্কালখানার পানে চাহিয়া মনোরমা পুনরায় বলিল, এই হাড় ক'খানা গঙ্গায় দিস ভাই, বড্ড জ্বরে ভুগেছে।

দিন দুই বাদে মনোরমা যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, রহিম কোথা হইতে আসিয়া বলিল, কোথায় যাচ্ছ দিদি ?

এস ভাই রহিম, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি, দেখা হ'ল ভালই হ'ল।

তুমি চলে যাচ্ছ ?

হ্যাঁ ভাই ; আমার সতীনপো, সে ত আমারই ছেলে, আমি তারই কাছে কল্‌কাতায় গিয়ে থাকব, সে আমায় কখনই ফেলতে পারবে না। তুমি খুব

ভাল হয়ে থেকো ভাই। আর যেন গরীবের উপকার করতে যেও না, তা হ'লে ও হাতটিও যাবে। চল বেরোই, বলিয়া চক্ষের জল মুছিয়া একটা ছোট পুঁটুলি লইয়া রহিমের কাঁধে হাত দিয়া সে বাহির হইল।

সেদিন সকাল বেলা খগেনবাবুর সুমুখে গিয়া রহিম বলিল, আমার মাইনে চুকিয়ে দিবেন কর্ত্তা।

বিস্মিত হইয়া খগেনবাবু বলিলেন, মাইনে! কিসের?

যা পাওনা আছে।

ওঃ, বলিয়া অলক্ষ্যে তিনি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। এ মুখের সহিত তাহার কোনও দিনই পরিচয় ছিল না। আজ দেখিলেন মুসলমান জাতির সমস্ত কাঠিন্যের চিহ্নটুকু সে মুখে বর্তমান, বয়স অল্প হইলেও জাত সাপ বটে!

হ্যাঁ বাকি আছে বটে,—মাইনে নিয়ে কি করবি রহিম?

দেশে যাব, আর তোমার তরফে কাজ করব না।

আচ্ছা, ওবেলা দিয়ে দেবো।

বিকাল বেলায় মাহিনা লইয়া রহিম দেশে মা বাপের কাছে চলিয়া গেল।

সান্ধ্য সমিতির আড্ডা তেমনিভাবে বসে। তাস খেলাও হয়। চাঁদা আদায়ও সেইভাবে হয়। খগেনবাবু বলেন, সাত মাসের চাঁদা বাকি রেখে ডুব মারলে, জমিদারের বেটা কিনা!

বলাই বলে, আপনারও তিনমাসের বাকি।

খগেনবাবু তেমনি ভাবেই বলেন, ওই যা, পাঁচ কাজে ভুলে গিছি।

ভাঙ্গা বাড়ী তেমনি পড়িয়া আছে। রাত্রির ভয়ার্ত অন্ধকার তেমনিভাবেই শূন্য পুরীতে জমাট বাঁধে, ঝিঁ ঝিঁ কাঁদে, শেয়াল ঘুরিয়া যায়।

মুক্তি ঃ

নাটমন্দিরের নাচ শুরু হইয়াছে। গায়িকা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সকলের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া নমস্কার করিল। জরির কাজ করা তাহার গায়ে পাতলা আবরণ! উজ্জ্বল আলোয় তাহার ওপর ঝলকে ঝলকে বিদ্যুৎ ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

নিস্তব্ধ নির্বাক দর্শকমণ্ডলী ঘাড় নাড়িয়া তাহাকে উৎসাহ দিল।

সম্মুখে কষ্ঠি পাথরের কৃষ্ণমূর্তি! গায়িকা মুহূর্ত্তমাত্র তাহাব দিকে মুদিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আপনার গায়ের আবরণখানি মাটিতে নিক্ষেপ করিল। আজানুকণ্ঠ সূক্ষ্মনাচের পোষাক তাহার গায়ে গায়ে জুড়িয়া আছে।

প্রথমে ভূমিকা ; তাহার পর নাচ। সমস্ত দেহখানি হিল্লোলিত করিয়া নৃত্যশীলা গায়িকা দেখিতে দেখিতে রাত্রির চেতনাহীন মোহকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল। দর্শকগণ তাহার সুস্পষ্ট প্রত্যেক অঙ্গটির দিকে সুরাবিহ্বল ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বাহিরের তামসী রাত্রির নিবিড় নিস্তব্ধতা। অদূরে পূর্ণতোয়া কলস্বনার উচ্ছল স্রোত বহিয়া চলিতেছে। কলস্বনার তীরে প্রতিদিন এমন সময় বাঁশী বাজে। গায়িকা নাচে আর কান পাতিয়া সেইদিকে শোনে। তাহার সেই নৃত্যের মধ্যে সেকি কারুণ্যের রস! তালে, ভঙ্গীতে, লীলায়—যেন পৃথিবীর সমস্ত কান্না ফেনাইয়া উঠে। অথচ বাঁশী না বাজিলে গায়িকা নাচ সুরু করিতে পারে না। তাহার সুরের মধ্যে অন্তরলোকের যে চির মৌন আর্তনাদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়,—গায়িকা সেই ভাষাহীন রহস্যময় শব্দটিকে রূপায়িত করিয়া তোলে।

কিন্তু এই বাঁশী যে বাজায় তাহাকে গায়িকা কোনদিন দেখে নাই।

বাহিরে সেই বাঁশীর আওয়াজ—ভিতরে সেই পরিপূর্ণ যৌবনের নৃত্য—দর্শকেরা নিশ্চল হইয়া চাহিয়া থাকে। জল স্থল আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া

যে সুর প্রকৃতির এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বাষ্পাকুল করিয়া তোলে, তাহারই সঙ্গে যেন আকুল হইয়া ওঠে।

ক্রমে রাত্রি ঘন হইয়া আসে। মন্দিরের আলো ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়। রুদ্ধ অশ্রুর চাপে চারিদিক জমাট হইয়া ওঠে। রাত্রির মুহূর্ত্তগুলি যেন নিশ্চল কলস্বনার স্রোত। যেন থামিয়া গিয়াছে। বনে বনান্তরে মর্ম্মরধ্বনি বুঝি আর জাগে না; জীবজগৎ গাছপালা, আকাশ পাতাল,—সমস্ত বিশ্বলোক এই সুন্দরী নৃত্যশীলার সূক্ষ্মতম আবরণের মধ্যে সমস্ত নগ্ন দেহখানির লীলায়িত ভঙ্গির দিকে বিপুল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। নাচের ভূমিকায় যে দর্শকমণ্ডলী লালসাতুর পশুর মত গায়িকার অবয়বের দিকে তাকাইয়া হাঁস ফাঁস করে, এইবার তাহারা মানুষের মধ্যে ফিরিয়া আসে। রুদ্ধনিশ্বাসে গায়িকার দিকে তাহারা সজল চোখে চাহিয়া থাকে।

তারপর কলস্বনার উপকূলে বাঁশী আর বাজে না। গায়িকার নাচও সেই সঙ্গে থামিয়া যায়।

দর্শকেরা তখন জাগিয়া ওঠে। গায়িকা সেই নিক্ষিপ্ত আবরণখানি তুলিয়া আবার নিজের গায়ে ঢাকা দিয়া আড়ালে চলিয়া যায়।

মূক দর্শকবৃন্দ সাশ্রু নেত্রে ঘরে ফেরে।

এমনি প্রতিদিনই!

কিন্তু প্রতিদিনের নাচের সঙ্গে প্রতিদিনের মিল নাই। এইটুকুই বিস্ময়। প্রতিদিন নব নবতর রূপে, রসে, প্রকাশে, বেদনায়, কারুণ্যে গয়িকার নির্ব্বাক নৃত্য সকলকে অভিভূত করিয়া তোলে।

আর সে কি তাহার যৌবনশ্রী! মনে হয়, মাটির কানায় কানায়, কলস্বনার উর্ম্মিরেখায়, আকাশের কিনারায়, বাতাসের ইসারায় তাহার যৌবনের আবেগ রোমাঞ্চ হইয়া ওঠে।

গায়িকা মধুর হাসি হাসিয়া বলে—আমার নিজের শক্তি ত কিছু নেই, বাঁশী বাজে বলেই আমি—

শিল্পীর স্বাভাবিক বিনীত উদারতা ভাবিয়া সবাই চুপ করিয়া থাকে।

কিন্তু কে এবং কোথায় এই বংশীবাদক !

তারপর আবার বাঁশীর করুণসুর রাত্রির অন্ধকারে শেষ নিশ্বাস ফেলিয়া মিলাইয়া যায়, দেখিতে দেখিতে গায়িকার লীলায়িত তনুলতাটির নৃত্যভঙ্গিও থামিয়া আসে।

দিনের ওপর দিনের লুণ্ঠন চলে এমনি করিয়াই।

সেদিন দর্শকেরা চলিয়া যাইবার পর মন্দির জনশূন্য হইলে গায়িকা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। দূরের বাঁশীর আওয়াজ একটু আগেই থামিয়াছে। সেইদিকে লক্ষ্য করিয়া বরাবর সে নদীর ধারে আসিল।

চাঁদনী রাত্রি। পাড়ের কাছে নদীর জল চকচক্ করিতেছে। গায়িকা চারিদিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল কেহ নাই। নদীর স্রোত যেইদিক হইতে আসিয়াছে আর যেইদিকে মিলাইয়া গিয়াছে—দুইদিকে শুধু অস্পষ্ট সাদা আকাশ। এক আকাশ তারা চন্দ্রালোকে ম্লান হইয়া গিয়াছে।

গায়িকা সেই দিনের মত ফিরিয়া গেল। হাসিতে হাসিতে আপন মনেই বলিল—এ বাঁশী কেউ বাজায়, না আমার নিজের মধ্যেই বাজে !

কিন্তু রহস্য আর রহস্য থাকিতে চায় না।

সেদিন উন্মুখ ব্যাকুল দর্শকবৃন্দকে ফাঁকি দিয়া গায়িকা মন্দিরের পিছনের দ্বারপথে বাইরে বাহির হইয়া আসিল।

বংশীধ্বনিতে আর রহস্য নাই—স্পষ্ট, সহজ, সকরুণ !

নদীর পথে গায়িকা চলিতে লাগিল। এ এক অচেতন পথচলা ! এ

পথের কোথায় সুরু আর কোথায় শেষ,—সে যেন নিজেই জানে না। মনে হইল সে ছাড়া, এই বিশ্বব্যাপিনী প্রকৃতি শরাহতা কপোতীর মত ভাষাহীন বেদনার রক্তে ডুবিয়া ডুবিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। বাঁশীর প্রত্যেক গমকে যেন পৃথিবী নব নব রঙ্গে রঙিন হইয়া উঠিতেছে, নব নব জাগরণে জাগিয়া উঠিতেছে।

মাটির তলায় এই বিশ্বের নির্ব্বাসিত নিদ্রিত আত্মা বিদীর্ণ ধরিত্রীর মধ্য হইতে উঠিয়া আসিয়া যেন বলিতে চায়, থামাও—বাঁশী তোমার থামাও। মৃত্তিকার প্রাণরহস্যকে জাগিও না। মানুষকে কাঙাল ক'র না!

প্রথমে নিকটে গিয়া গায়িকা বংশীবাদককে দেখিতে পাইল। যুবক সুন্দর, সুপুরুষ! মাথায় শিকড়ের মত জটা জটা চুল। পিছন দিকে গিয়া নিঃশব্দে সে দাঁড়াইল।

এই নির্জন নদীতীর, সম্মুখে অপরিচিত পুরুষ, সে যে সুন্দরী যুবতী,—এ সব আর তাহার খেয়াল নাই।

অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। পাদুইটি ভারি বোধ হইতেছে। শরীর কেমন যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। মনে হইল, তাহার মূল্যবান গাত্রাভরণগুলিতে নিতান্ত গুরুভার বোধ হইতেছে।

এমনিভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গায়িকা আবার নিজের পথে চলিয়া গেল। পরদিন ঠিক সময় আবার সে ঠিক জায়গাটিতে আসিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। আজ কিন্তু আর একটু কাছে।

বাঁশী তেমনি একমনে বাজিয়া চলিয়াছে—কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। কি ছাই নাচ!—গায়িকা ভাবে।

অত্যন্ত সন্তর্পণে সে অদূরে বালুচরের ওপর চুপ করিয়া বসিল। সে যেন নিতান্ত দীন—নিতান্ত দরিদ্র।

আর একটু কাছে সরিয়া গেল।

এতক্ষণে বাঁশী থামিল। গায়িকা চম্‌কাইয়া উঠিতেই তাহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

যুবক একবার মাত্র তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইল, তারপর আপন মনেই উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সে যে একটি জীবন্ত মানুষ, যুবতী নারী সে, সে যে জীবন্ত জানোয়ার অথবা জড় পদার্থ নয়,—যুবকের মুখে এইসব কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। চাঁদের আলোয় ছায়ার মত মিলাইয়া গেল।

গায়িকাও নিতান্ত ভারাক্রান্ত মনে আপনার পথ ধরিল।

রাত্রির অবগুণ্ঠনে আবার দিবালোকের মুখ ঢাকা পড়িতে থাকে।

দুইদিন আর গায়িকা সে পথে গেল না।—অভিমান!

মুখের দিকে একবার ফিরিয়াও তাকায় না। অহঙ্কার কি তাহার এতই বড়!

কিন্তু তৃতীয় দিনেই আবার গায়িকা গিয়া হাজির। এবারে আর পিছন দিকে নয়, পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

বাদকের কিন্তু হুঁস নাই। সে তখন বাঁশীতে বিভোর। অবশ দেহে গায়িকা কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। এমনি কতক্ষণ কে জানে! তারপর কখন নিজের অজ্ঞাতে সে এক-পা এক-পা করিয়া একেবারে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

এই বাঁশীর উচ্ছ্বাসের কোন ভাষা নাই। মনে হইতেছিল, সমস্ত বিশ্ব-সংসার অটল শান্তিতে স্তব্ধ হইয়া সুর শুনিতেছে। ঘূর্ণীর গতি যেন কমিয়া গিয়াছে।

গায়িকা নিঃশব্দে সেখানে বসিয়া পড়িল। বংশীধারীর চমক ভাঙিল এতক্ষণে। বাঁশী থামাইয়া মুখ তুলিয়া বলিল—কি চাও?

গায়িকার মুখে কথা নাই। আকাশের পরিষ্কার চাঁদের আলোয় তাহার গায়ের আভরণ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। ঘাড় বাঁকাইয়া হেঁট হইয়া বালির ওপর আঁক কাটিতে লাগিল। যুবক স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

গায়িকা বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। এমন করিয়া কেউ যে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারে, তাহা সে জানিত না।

মুখ তুলিয়া বলিল—তাকাও কেন অমন করে?

যুবক একবার আকাশের চাঁদের দিকে চাহিল; তারপর হঠাৎ বলিল—এত রূপ তোমার?—বলিয়া সে হাতের কাছে পান-পাত্র তুলিয়া লইয়া কি একটি তরল বস্তু পান করিতে লাগিল।

গায়িকা উঠিয়া দাঁড়াইল, ঘৃণায় নাসাকুঞ্চন করিয়া বলিল—ছি ছি!—আর দাঁড়াইল না। দ্রুতপদে আপনার ঘরের দিকে চলিল।

কিন্তু পরের দিন আবার যখন বাঁশী বাজিতে শুরু করিয়াছে, তখন দেখা গেল গায়িকা আবার সেই পথে আসিতেছে। তেমনি শিথিল গতি, তেমনি অবশ তনু-মন। মগ্ন চেতনার মধ্যে তাহার তখন সুরের আগুণ ধরিয়া গিয়াছে।

যুবকের কোন দিকেই খেয়াল নাই। গায়িকা ধীরে ধীরে আসিয়া সম্মুখে বসিল।

যুবকের চোখে জল। বাঁশীর সঙ্গে তাহার চোখের জলের ভাষা মিলিয়া গিয়াছে। গায়িকা চুপ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এক দৃষ্টি! অভিভূত-অচেতন,—ঘুমন্ত!

তারপর আরও কাছে সরিয়া আসিল। ধীরে ধীরে যুবকের গায়ে হাত রাখিল। মুখে হাত দিল। গায়ে, মাথায়—বুকে।

গায়িকার সর্বাঙ্গ তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। জড়িতকণ্ঠে বলিল—তুমি—তুমি কে?

বাঁশীর স্বরে যুবক বলিল—আমি পুরুষ! তুমি কি জীবনে পুরুষ দেখনি?

দেখেছি। কিন্তু তোমাকে কখনও—

পুরুষের স্পর্শও পাওনি কোনদিন?

গায়িকা নির্বাক।

বাঁশী হইতে মুখ সরাইয়া যুবক গায়িকার একটি হাত ধরিয়া বলিল—তোমার যৌবনশ্রীর কি অর্থ জানো?

বোধহয় সে একটুখানি হাসিয়াছিল—গায়িকা হাত ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—কি ?

যারা ভোগী তারা তোমার দেহকে নিষ্পেষণ করতে চায়।

তুমি ?

যুবক হাসিয়া বলিল—আমি! আমিও ত মানুষ! কিন্তু আমি সেই শক্তির অধিকারী, যে তোমার ওই রক্ত মাংস বাঁশীর ফুৎকারের মধ্যে উড়িয়ে দেবে।

গায়িকা মুখ তুলিয়া চাহিল।

যুবক দূর নদীরেখার দিকে চাহিয়া বলিল—শুধু থাকবে তোমার সৌন্দর্য্যের আত্মা যার ছোঁয়াচই আমার শক্তি দান করবে।—বুঝলে ?

গায়িকা ভয়ে ভয়ে উঠিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

বাঁশী আবার বাজে। সে বাঁশী গায়িকাকে সংসারের প্রতি উদাসীন করিয়া তোলে।

অলঙ্কার, আভরণ সব কিছু সে খুলিয়া ফেলিল। প্রসাধন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া গৈরিক বসনে দেহ আবৃত করিল।

আজকের এই বাঁশীর আওয়াজে তাহার কান্না আর থামিতে চাহে না। মাঠের বাঁশী যেন নিঃস্বের প্রলাপ গান।

ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গায়িকা যুবকের কাছে গিয়া বলিল—এ তোমার কি প্রলোভন, আমি ছাড়াতে পারি না যে! আমায় মুক্তি দাও, তোমার পায়ে পড়ি।

যুবকের পায়ে সে লুটাইয়া পড়িল। যুবক বলিল—দেহের মুক্তি ত নেই গায়িকা!

তবে ?

যার মুক্তি নেই, সে তোমার নয়। যে তাকে চাই—তারই।

যুবক তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

গায়িকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। বলিল—তোমার ওই বাঁশীর কাছেই আমি নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাই।

কিন্তু তোমার দেহ যে বাধা!

আবার সেই হেঁয়ালী! গায়িকা শুধু বলিল—তবে?

দেহের ভেলায় চড়ে তার কাছে যেতে হয়। লাফিয়ে ত ওপারে যাওয়া চলে না, গায়িকা! বাঁশী যে বাজায় সেই তোমার কর্ণধার।

উত্তরে যুবক কুৎসিত হাসি হাসিল। গায়িকা আর কোন কথা বলিল না।

যুবক আবার বাঁশী তুলিয়া বাজাইতে শুরু করিল। একহাতে বাঁশী বাজায়, আর একহাতে গায়িকার গায়ে হাত বুলায়।

গায়িকা বলিল—তোমার স্পর্শ এমন রোমাঞ্চকর কেন?

আমি যে পুরুষ!

অভিভূতের মত গায়িকা বলিল—তুমি কি চাও?

রক্ত চাই, মাংস চাই, তোমার দেহের আগুনে ডুব দিতে চাই।

যে এমন বাঁশী বাজায়, সে এমন কুৎসিত কেন?

উত্তরে যুবক গর্বিতকণ্ঠে বলিল—যে বাঁশী বাজায়, সে অন্য একজন। তোমার মত লক্ষ সুন্দরীকে সে চায় না—আমি তোমাকে চাই। আমি সম্ভোগ ভালবাসি।

সম্ভোগের মধ্যে আত্মা কি ক্লেদাক্ত হয় না?

না। যদি আগুন থাকে।

ওকি, কাঁদছ কেন অমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে?

নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া গায়িকার সে কী কান্না! নিজের হাত কামড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া, মাথা ঠুকিয়া—রোরুদ্যমানা গায়িকা যেন নিজেরই টুঁটি কামড়াইতে চায়।

জীবনে সে পাপ করে নাই। আজ আত্মহত্যা করিয়া বসিল। লজ্জায়, ধিক্কারে, অপমানে, বেদনায় গ্লানিতে,—সে এক মর্মান্তিক কান্না!

হয়ত তাহার ক্লেদাক্ত আত্মার আর্ত্তনাদ!

কিম্বা হয়ত তাহার ভিতরে কোথাও কোনদিন আগুন জ্বলে নাই।

পরদিন ভোর রাত্রে সকলে বিস্ময়ে দেখিল, মন্দিরের কৃষ্ণ মূর্ত্তির সম্মুখে নাটমন্দিরে গায়িকার রক্তাক্ত অচেতন দেহ পড়িয়া আছে।

গলা কাটা। হাতের কাছে একখানা ধারালো অস্ত্র।

সেইদিন হইতে বাঁশী আর বাজে না।

সর্ব্বংসহা।

অবশিষ্ট তাহার আর কিছুই নাই, এই কথা সহজেই বলা চলে। যৌবনকাল তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে। আমিও তাহাকে দেখিয়াছি অনেক দিন। তিন বছর প্রায় হইল। কপালে তাহার মাত্র দুইটি রেখা ছিল প্রথম প্রথম, কিন্তু তৃতীযটি কোন্ দিন অলক্ষ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, সেও তাহা লক্ষ্য করে নাই, আমিও না।

আরসিতে মুখ দেখতে আমি ভালবাসিনে ছেলেমানুষী এমন—ভুসো কালী মাখা হাতখানা তুলিয়া সে মাথার ঘোমটা একটু টানিয়া দিল,—একই চেহারা দেখছি চল্লিশ বছর ধ'রে, নিজের কাছে নিজেই পুরণো।

চটগুলো দাগি করিয়া গুণিযা গুণিয়া সে দেখে, আমি সেই অঙ্কটা খাতায় টুকিয়া লই। একই চটকলে আমার সঙ্গে সে চাকরী করে। নাম তাহার নেত্য। বাঁকুড়ার কোন্ গ্রামে অনেকদিন আগে ছিল তাহার ঘর। কিন্তু সে সব চুকিয়া গিয়াছে। স্বামী তাহার একজন ছিল বৈকী, কিন্তু তাহার কথা খুঁটিয়া আমি এই তিন বছরের মধ্যে একদিনও শুনি নাই। একদিন তাহাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, কবেকার কথা, সে কি মনে পড়ে?

তারপরের ইতিহাসটি বলিতে সে আমাকে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। একটি স্বভাব-সরলতা তাহার দেখিয়াছি। বোকা নয়। জীবনের বহু ঘাট তাহাকে ছুঁইয়া ছুঁইয়া আসিতে হইয়াছে।

ত ক'—একটি লিখিল সে চটের উপর অতি যত্নে, তারপর হাসিমুখে বলিল, আচ্ছা, হেসো না তুমি, যদি রোজ আরসিতে দেখতাম নতুন নতুন নিজের চেহারা, ধরো রোজ রোজ বদ্‌লাচ্ছে হ্যাঁ, সবাই ত হাসবে তোমার মতন—

রূপ তাহার নাই, আগেও ছিল না। দাঁতের মাড়িটা তাহার বিসদৃশভাবে চওড়া, হাসলে তাহার দাঁতের দিকে আর তাকানো যায় না। গলার নীচে

বুকের কাছাকাছি তাহার একটি উল্কিকাটা "মদনমোহন"-এর ছবি। মাথার চুল অনেকটা উঠিয়া গিয়া তাহাকে আরও কুরূপা করিয়াছে। কিন্তু এই কুরূপের খরিদ্দারও ত জুটিয়াছে। কেন জুটিয়াছে তাই ভাবি।

এত কুশ্রী চেহারা কিন্তু সামান্য কারণে একমুখ হাসি হাসিলেই তাহার সেই কুশ্রীতার একটি ছন্দ দেখা যাইত। হাসিতেই তাহার রূপ। স্বভাব-সরল পরিচ্ছন্ন তাহার সেই হাসি। এই ঐশ্বর্যে সে জয় করে পুরুষের মন। পুরুষের আছে জন্মগত সৌন্দর্য-পিপাসা।

চাকরী করা কি মেয়েমানুষের ভালো?—এই প্রশ্নটা নেত্য নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে। আমার উত্তরটা শোনবার দরকার নাই।

কিন্তু না করেই বা কি করবো বল? পরের হাত তোলায় থাকলে পেটের ভাত স্থায়ী হয় না।

তবে আর কি, চাকরী করাই তো ভালো।

কেমন করেই বা ভালো! টাকা থাকে কি আমার হাতে? সব টাকাই দিই প্রভুর চরণে!

কেন দাও?

নেত্য হাসিল। সেই বিশ্রী মাড়ি-বার-করা সুন্দর হাসি। বলিল, দিতেই ভালো লাগে।

চিনি আমি নেত্যর সেই লোকটিকে, যে লোকটি অম্লান-বদনে নেত্যর টাকাগুলি হাত পাতিয়া লয়। দ্বিধা-সঙ্কোচ কিছু নাই, এ যেন তাহার পাওনা, চিরকালের পাওনা। একটি নারীর আত্মসমর্পণের ষোলো আনা সুবিধা সে নেয়। মাঝে মাঝে তাড়া খাইয়া হল্লা করিতেও তাহাকে দেখিয়াছি।

এই নেশাও একদিন তাহার কাটিল। কাটিল অতি সহজেই। কোনো নাটক নয়, সংঘাত নয়, বিদায়ের পালা গাওয়াও নয়। এই প্রত্যাশা লইয়াই

নেত্য বসিয়াছিল। তাহার অবারিত খোলা দরজায় পুরুষের অবারিত প্রবেশ ও প্রস্থান। সতর্ক হওয়া তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ।

শুনেছ, সে আর আসবে না?

জানতাম আমি।

হ্যাঁ, তা জানবেই ত! তোমারই জাত সে। তাই ব'লে আমি দুঃখ করব?—নেত্য হাসিয়া বলিল, যাবে বলেই তো সহজে আসে।

গলা নামাইয়া সে পুনরায় কহিল, তুমিও জানো যা বলছি। যত্ন করার মানুষ না হ'লে একলা বেঁচে থাকা বড় শক্ত।

বলিলাম, কিন্তু ধরো তোমার এই বয়সে—

এই বয়সে? হ্যাঁ, বুড়ো হয়ে গেছি বটে। কিন্তু মরণ ত হ'বে, ফেলবার লোক কে থাকবে তখন? চাকরী ক'রে খাওয়াবো যাকে চিরকাল, মুখে সে একটু আগুনও দেবে না? মদনমোহনের দয়ায়—

তবু ত সবাই তোমাকে ঠকালে।

হ্যাঁ, আমি ঠকাবো একদিন যেদিন মরব। হঠাৎ মরব একদিন, কাছে যে থাকবে তার ওপরেই শোধ তুলে নেব সব।

যদি কেউ না থাকে? তোমার মদন মোহন সেদিন ত আর এসে দাঁড়াবে না!

দাঁড়াবেন বৈ.কি। অমন কথা বলতে নেই। কপালে দুই হাত ঠেকাইয়া একান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে নেত্য হাসিল। পুনরায় বলিল, এত করলাম তোমাদের জন্যে, আর শেষের দিনে আমি থাকবো একলা? বিচার নেই পৃথিবীতে?

সন্ধ্যা-প্রদীপটি ঘরের দরজায় রাখিয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া একটি প্রণাম করিয়া নেত্য বলিল, তুমি যাই বলো, এখনো আমার শেষ হয়নি, ফুরোয়নি সব। মদনমোহনের নৈবেদ্যি এখনো অনেকবার সাজাতে পারবো। সকলেরই মধ্যে তিনি আছেন।

এর পরে আবার তুমি ভালবাসবে?

নৈলে বাঁচবো কেমন করে ?—আবার হাসিয়া নেত্য তাহার ঘরে চলিয়া গেল।

কলের বাঁশী বাজিবার একটু আগে সেদিন নেত্য আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল, সকাল থেকেই শুন্‌ছি, তোমাদের এদিকে এত চেঁচামেচি। কেন ?

বলিলাম, বিরিজলালের বৌটা—প্রসব বেদ্‌না—

ও। বলিয়া নেত্য দাঁড়াইল।

দীন-মজুরদের এই ক্লিষ্ট-কিন্ন জীবনযাত্রার ভিতরেও প্রকৃতি আপন পুনরুক্তি করিয়া চলিয়াছে অবিশ্রান্ত। জীবন ও মৃত্যুর আলোছায়া। নেত্য আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আচ্ছা, বলো তো ছেলে হবে, না মেয়ে ?

নেত্য বলিল, বিরিজলালের বৌ কি চায় জানো ?

তাহার কণ্ঠে ছিল কিছু উত্তেজনা, কিছু কম্পন। মুখ তুলিতেই সে বলিল, আমি জানি ও চায় মেয়ে ! মেয়ে হলেই বৌটা খুশী হবে।

কেন ?

দুর্ভাবনা থাকবে না, কাঁদবে না। ছেলে বড় হ'লেই হবে পুরুষ। নিষ্ঠুর, দুরন্ত পুরুষ। আমারো একটি ছেলে ছিল—

তোমার ছেলে ?

হ্যাঁ, আমারই—নেত্যর মুখের উপর একটি বিস্মিতপ্রায় অতীত জীবনের কমনীয় মাতৃমূর্তি ভাসিয়া উঠিল। সে আমার চোখের ভুল নয়। মায়া-কল্পনা নয়।

আমারই পেটের ছেলে, বিশ্বাস করো। বড় হলো সে দিনে দিনে। আমার বুকের ভেতর ভয়ে কাঁপতে লাগলো, সেও ত অত্যাচারী হবে, পাপ করবে ! বুঝতে পারোনা, দেখতে পাওনা যে, তারা দেয় না ভালবাসার দাম ? বারে বারে তারা বুক ভেঙে দিয়ে যায় মেয়েমানুষের ? আঃ, আমি মদনমোহনের পূজো দেবো, পুরুষ যেন আর পৃথিবীতে না জন্মায়।

তোমার সেই ছেলে কোথায় ?

পনেরো বছরের হ'য়ে মারা গেছে। বেঁচে গেছি ভাই। বলিয়া নেত্য হাসিল। তাহার চোখের জল চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল। কিন্তু সেইটি করুণ, বাৎসল্যময়ী মাতৃমূর্ত্তি। সে দুঃখের গোপনতম রহস্যটি আমি বুঝি নাই।

বাঁশী বাজিল।

এসো যাই।—বলিয়া নেত্য অগ্রসর হইল। আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। হ্যাঁ, বিরিজলালের বৌটা খুব কষ্ট পাইতেছে।

দিন মজুর।

চটকলের মজুরদের ভিতর লাদুই ছিল রঘুসর্দ্দারের প্রিয়। একদিকে সে তরুণ এবং বলিষ্ঠ, অন্যদিকে তেমনি কর্ম্মঠ এবং চতুর। অল্পদিনেই আপন গুণে এবং সর্দ্দারের সুনজরে পড়িয়া সাধারণের অপেক্ষায় তাহার মাসিক তলবও কিছু বাড়িয়া গিয়াছিল। এজন্য রঘুসর্দ্দারের প্রতি তাহার মনে মনে কৃতজ্ঞতাও ছিল।

তাহার মধ্যে একটি কথা ছিল। মজুরিগিরিতে হাজার ওস্তাদ হইলেও রঘুসর্দ্দার আপনার স্বার্থের বাহিরে কাহারও উপকার করিত না কিন্তু লাদুর প্রতি নিঃস্বার্থ উপকারের অন্তরালে যে একটা কিছু রহস্য আছে ইহা সাধারণে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও অনেকটা আঁচ করিয়া লইয়াছিল এবং ইহা সেইদিন সত্যে পরিণত হইল যেদিন ওলাউঠার মহামারীতে রঘুসর্দ্দার চক্ষু বুঁজিল।

মরিবার সময় লাদুকে খুব কাছে ডাকিয়া শিয়রের কাছে তাহার সংসারের একমাত্র কন্যা মহুয়াকে দেখাইয়া বলিয়াছিল, ওকে তোর হাতে দিয়ে যাচ্ছি লাদু, তুই ওকে বিয়া করিস, ওর আর কেউ নাই—বলিতে বলিতে তাহার স্বর বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। লাদু তাহাই শপথ করিয়াছিল।

এসব অনেকদিনের কথা। তারপর তিনবৎসর চলিয়া গিয়াছে। কথাটা তখন অল্পাধিক চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও এই দীর্ঘ দিনে সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল; মহুয়া কিন্তু ভোলে নাই। তাহার বয়স সতেরো হইতে কুড়িতে দাঁড়াইয়াছে। সে যখন তখন কলে আসিত, ইচ্ছামত কাজ করিত, গুন গুন করিয়া গান গাহিয়া বেড়াইত, আবার কোনও কোনও দিন খেয়াল বশে মাথার খোপায় ফুল গুঁজিয়া, মুখখানি মুছিয়া কোমরে ফেরতা দিয়া কাপড় পড়িয়া শুধু শুধু ঘুরিয়া বেড়াইত। লাদু দেখিয়া শুনিয়া গম্ভীর হইত, কাছে আসিলে 'কাজ আছে' বলিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইত। তাহার ভয় ছিল পাছে পূর্ব্বেকার শপথের কথা মহুয়া স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই শপথের কথা ভোলে নাই আর একজন, সে সরযূ। সুতরাং লাদুর সহিত মনুয়ার বিবাহ হইবে নিশ্চয় জানিয়া সে যখন তখন সেই কথা লইয়া তামাসা করিত, মাথার খোপা টানিয়া খুলিয়া দিত, আঁচল ধরিয়া টানিত এবং সময় সময় গাল টিপিয়া দিয়া পলাইয়া যাইত। মনুয়া তাহাকে গালি দিত, লাথি দেখাইত এবং শেষে কিছু না পারিয়া চুল ছিঁড়িয়া কাঁদিতে বসিত।

সেদিন কল বন্ধ। মাথার উপর ঠিক দুপুরের রোদটা চন্‌চন্‌ করিতেছিল। ওধারের কলের শেষ সীমানায় পাঁচিলের পাশে মজুরদের আবাসগুলা নিস্তব্ধ। মনুয়া জানিত আজ একলা লাদু কেবল হিসাব-নিকাশ লইয়া থাকিবে, অতএব এই অবসরে সকলের অলক্ষ্যে একবার সে লাদুর সহিত দেখা করিতে গেল।

একটা হল ঘরে কতকগুলা পাটের গাঁইটের কাছে দাঁড়াইয়া লাদু তখন আল্‌কাতরা দিয়া সেগুলাতে দাগ দিতেছিল। মনুয়াকে দেখিয়া বলিল, এত জরুরী, কী চাই রে? মনুয়া হাসিয়া ফেলিল কিন্তু পরক্ষণেই লাদুর মুখভঙ্গীতে অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, কিচ্ছু না।

তবে?

তুই কি কচ্ছিস দেখতে আসলুম—

লাদু আবার কাজ করিতে লাগিয়া গেল। মনুয়া নেহাৎ বেয়াকুবের মত দাঁড়াইয়া তাহার কাজ দেখিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে লাদু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আড়চোখে চাহিয়া বলিল, আমার উপর তোর এত টান কেন রে মনুয়া?

মনুয়া আবার হাসিয়া বলিল, ছাই টান্।

তবে এলি কেন?

আমার খুসী।

তোর খুসী তবে সরযূর কাছে গেছিলি কেন?

মনুয়ার কালো মুখ লাল হইয়া উঠিল, বলিল, তার সাথে আমার কি?

আমার সাথে তোর কি?

তোর সাথে আমার বিয়ে হবে না? কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে লজ্জিত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল; লাদু বাধা দিয়া বলিল, কে বলে আমি তোকে বিয়া করব?

অবাক হইয়া মহুয়া বলিল, কে বলে! তুই ত বাপকে ছুঁয়ে দিব্য করিছিলি।

লাদু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, তুই খুব রং করতে জানিস তো মহুয়া!

বড় বড় চোখ করিয়া মহুয়া বলিল, রং কিরে?

লাদু তেমনি ভাবেই বলিল, তুই কি পাগল আছিস্, আমি তোকে বিয়া করতে যাব কেন? তখন ধরে বেঁধে তোর বাপ একটা মিথ্যে দিব্যি করিয়ে নিয়েছিল—তা ছাড়া—

কি?

তা ছাড়া সর্দ্দার ত আর বেঁচে নেই!

মহুয়ার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল, বলিল, সত্যি বলছিস্?

লাদু মিথ্যে বলে না—

দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া মহুয়া বলিল, তবে সেদিন আমায় নিয়ে অত সোহাগ কল্লি কেন?

লাদু অকপটে বলিল, তাতে কি হয়েছে,—তুই কিছু বুঝিস না, সোহাগ করলেই কি বিয়া করা হল। এই ত আবার করছি বলিয়া সরিয়া আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া নানারূপ সোহাগ করিতে লাগিল। মহুয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লাদু পুনরায় বলিল, এতে কি দোষ, তুই যে মেয়েমানুষ—এমন ত সরযূও করে—

এইবার মহুয়া জ্বলিয়া উঠিল। চিৎকার করিয়া বলিল, না সে করে না, কখনও না, সে তোর মতন নয়—বলিয়া কথা বলিবার অপেক্ষা না করিয়া কান্না চাপিয়া দুম্ দুম্ করিয়া সে বাহির হইয়া গেল। কি করিতে আসিল কি হইল! রাগে দুঃখে তাহার গলা বুঁজিয়া আসিল।

বড় ফটক পার হইতেই সরযূর সঙ্গে দেখা। সে দাঁত বাহির করিয়া বলিল, ফর্‌কে কোথা যাস্ মনু? ওকি তোর চোখে জল কেন?

চিৎকার করিয়া মনুয়া বলিল, খবরদার, তুই আমার সঙ্গে কথা কস্‌নে সরযূ, তোর মুখে ছাই দি!

তোর হাতের ছাই ত?

হ্যাঁ আমার হাতের, এই হাতে, বলিয়া সে চোখে কাপড় চাপা দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যাইতেছিল। সরযূ কখনও তাহাকে কাঁদিতে দেখে নাই। সহসা উদ্বিগ্ন হইয়া নিকটে আসিয়া খপ্ করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, বল ভাই মনুয়া, কি হয়েছে, কাঁদছিস্ কেন? বস এখানে, বড় রোদ—বলিয়া ছায়ায় তাহাকে লইয়া গিয়া কাছটিতে বসাইয়া বলিল, কোথা গেছলিরে?

মনুয়া ফুঁপাইয়া বলিল, লাদুর কাছে।

ভালই ত, কাঁদচিস্ কেন?

সে দিব্যি করেছিল জানিস্?

হ্যাঁ, তোর সাথে তার বিয়া হবে ত?

না—

বিস্মিত হইয়া সরযূ বলিল, না কেন, কি বলে সে?

করবে না বলে।

ইঃ! করবে না, মগের মুলুক, আমি থাকতে চালাকি, বেটা এখন যদি ওকথা বলে তবে দেখে নিস্ মনু! আমি বেটাকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারি, কিন্তু বিয়ে করবে না কেন রে মনুয়া?

মনুয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তোকে আমাকে 'মন্দ' করে বলে, সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

কি বল্লি? সরযূর দেহের ভিতর একটা তড়িৎ খেলিয়া গেল। মনুয়া চুপ করিয়া রহিল। সরযূ আস্তে আস্তে উঠিয়া সেই পড়ন্ত রৌদ্রে এক হাঁটু লার উপর দিয়া টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।

কয়দিন ধরিয়া সরযূ এই কথাটাই ক্রমাগত ভাবিতে লাগিল কিন্তু ভাবনার কূল কিনারা পাইল না। ছল তামাসা যে দোষের নয় তাহা সেও জানিত, অথচ এই সন্দেহের সূত্র ধরিয়া কেন যে লাছু অমন করিয়া মনুয়ার ঘাড়ে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া দিল, ইহার ঠিক কারণটি সে বাহির করিতে পারিল না বটে কিন্তু লাছুর উপর তাহার যে রাগটুকু হইয়াছিল তাহা আর রহিল না, পরন্তু নিজেই যে মনুয়ার সুখের পথে একটা বিঘ্ন হইয়া পড়িল ইহাতেই তাহার নিজের মনে অহরহ ছুঁচ ফুটিতে লাগিল।

দুইদিন আগে সে নিভৃতে একবার লাছুকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, আমার কসুর মাপ করিস্ লাছু ভাই, তোর পায়ে পড়ি। কিন্তু লাছু তাহাকে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। গতকল্য আবার গিয়া বলিয়াছিল, আচ্ছা আমি যদি এখান হতে চলে যাই তবে তুই মনুয়াকে বিয়ে করে ঘর করতে পারবি? লাছু বলিয়াছিল, না—

অন্য কেহ হইলে সরযূ তাহাকে আখের মত চিবাইয়া খাইয়া আসিত কিন্তু, পাছে মনুয়ার কষ্টের কারণ হয় এজন্য সে লাছুকে কিছু বলিতে পারে নাই। মিথ্যা অপমানে এবং ক্ষুব্ধ রোষে ও অকারণ অনুতাপে ঘাড় হেঁট করিয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল।

সেদিনকার রৌদ্রটা বড় প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। বেলা আন্দাজ দেড়টার সময় সরযূ হাঁপাইতে হাঁপাইতে মনুয়ার কাছে আসিল। মনুয়া তখন তিন চারখানা পোড়া রুটি একধারে রাখিয়া লোটা করিয়া ডাল সিদ্ধ করিতে চড়াইয়াছিল। সরযূকে দেখিয়া বলিল, আবার এলি কেন তুই?

সরযূ তাড়াতাড়ি বলিল, একবার যদি চট্ করে আসিস্ মনু, তবে তোকে—

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মনুয়া বলিল, না আমি যাব না, তুই যা—খবরদার তুই আমার

কাছে আসিস্ না, তোর মুখ আমি দেখতে চাই না—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রোধ হইল।

সরযূ তাহার মুখ দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল, কিন্তু কাজটা অত্যন্ত জরুরী, তাই সে পুনরায় বলিল, যদি একবারটি আস্‌তিস্, তোর ভালর তোরেই—

আমার ভাল নেই, আমার কিছু নেই, তুই বেরো এখান থেকে, আমার দুয়ারে আর আসিস্ নে—

সরযূ না হটিয়া বলিল, তোর পায়ে পড়ি মনুয়া—

দপ্ করিয়া মনুয়ার রাগ চড়িয়া গেল। সম্মুখের রুটিগুলা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল, তারপর উনুনের উপর হইতে লোটাটা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া দ্রুতবেগে ঘরের ভিতর দিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, আমায় তোরা সবাই দুঃখ দিস্, আমার আজকে কেউ নেই—

সরযূর চক্ষেও জল আসিয়াছিল, কিন্তু সেখানে আর না দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল এবং খানিকক্ষণ অচেতন ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন পুনরায় ফিরিয়া আসিল, দেখিল মনুয়া চুপ করিয়া দুয়ারে বসিয়া আছে, চোখ দুইটা দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

ভয়ে ভয়ে নিকটে আসিয়া হাত যোড করিয়া বলিল, একবার চল মনু, লাদুর কাণ্ডটা একবার দেখবি।

মনুয়া চমকিয়া উঠিল, বলিল কি কাণ্ড?

একবার আয়্‌না আমার সাথে।

মনুয়া তৎক্ষণাৎ গায়ের কাপড় দুরস্ত করিয়া লইয়া সরযূর সহিত বাহির হইয়া আসিল।

বিরাট ঘর্ঘর শব্দে কল চলিতেছিল। অসংখ্য কুলি পুরুষ ও রমণীর কোলাহলে ভিতরটায় যেন একটা রোল উঠিয়াছে। সরযূ অন্যদিন হইলে

বাহির হইত না কিন্তু লাছু উপস্থিত না থাকিলে সে আর কাহারও পরোয়া রাখিত না। যখন তখন কাজ ছাড়িয়া চলিয়া আসিত।

যাহা হউক মনুয়াকে সঙ্গে করিয়া হন্ হন্ করিয়া সরযূ উত্তর দিকের ফটকটা পার হইয়া আসিল। এ ধারে কুলিদিগের আবাস। সকলে কাজে গিয়াছে বলিয়া প্রত্যেক ঘরেই তালা আঁটা। কেবল একটি ঘর খোলা ছিল। সরযূ ইঙ্গিতে অতি সন্তর্পণে মনুয়াকে সে ঘরখানা দেখাইয়া দিয়া বলিল, তুই পাচিলটার ধারে গেলে ঘরের ভেতরটা দেখতে পাবি—যা।

কি দেখব ?

একটু মুরুব্বীর ভান করিয়া সরযূ বলিল, তুই কথা শুনিস না মনু, তাই ত রাগ ধরে।

মনুয়ার বুকটা তোলপাড় করিয়া উঠিল। আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিয়া পাচিলের পাশে থাকিয়া উপর দিকে নজর করিয়া দেখিল, তাহারই সমবয়সী বাতাসীকে কাছে বসাইয়া লাছু উচ্ছলভাবে হাসি তামাসা করিতেছে, নানা-রকমে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

মনুয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খানিকক্ষণ বাদে পিছন হইতে কাঁধে হাত দিয়া সরযূ বলিল, আর কেন মনুয়া ? মনুয়া ঘাড় ফিরাইল ! তাহার চক্ষু দুইটা হইতে যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। যে জলের ফোঁটা দুইটা এতক্ষণ চোখের কোণে জমাট বাঁধিয়াছিল, তাহা ঝরিয়া পড়িল। শুষ্ক অথচ তীব্রকণ্ঠে বলিল, বাতাসীর নসিবও আমার মতন হবে ত ?

তুই কি করতে পারিস মনুয়া ?

হুঁ বলিয়া মনুয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, তোরে অত গাল দিয়েছি সরযূ, আমায় মাপ করিস, বলিয়া আর কোনও কথার অপেক্ষা না করিয়া স্খলিত পদে চলিয়া গেল। সরযূ কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। পুরস্কারের লোভে সে কি করিল, কিন্তু হইয়া গেল কি ! মনুয়া ততক্ষণ দুখীরামের বড় দোকানটা ছাড়াইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

দুই দিন মনুয়া কাজে আসিল না, তৃতীয় দিনে আসিয়া কাজে লাগিল। সরযূ দেখিতে পাইয়া বলিল, দুদিন আসিস্‌নে কেন মনুয়া ?

হুঁ।

একটা দরদের সুরে সরযূ বলিল, তোর চেহারা খুব শুক্‌নো হয়ে গেছে মনু ! মুখ ফিরাইয়া মনুয়া বলিল, তোর তাতে কি, বলিয়া আপনার কাজে মন দিল। সরযূ একটু অপ্রস্তুত হইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে একখানা চট সেলাই করিতে করিতে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিল, তাহার ঠিক পিছনেই স্তব্ধ হইয়া মনুয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিস্মিত হইয়া বলিল, কি চাইরে ?

কিছু না।

একটু চুপ করিয়া সরযূ বলিল, দুদিন আসিস্‌নি কেন আমি জানি, আমি তোকে পাহারা দিয়ে রেখেছিলুম বলিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে গিয়া সহসা মনুয়ার চোখের জল দেখিয়া স্তব্ধ হইল। মনু কাঁদিসনে ভাই, তোর চোখের জল দেখলে আমার—

কান্না আর থামিল না। সরযূ, আমার আর কেউ নেই, বলিয়া মনুয়া চোখে হাত চাপা দিয়া ফুঁপাইয়া উঠিল।

সরযূ একবার এদিক ওদিক চাহিল, নিকটে তখন কেহ ছিল না। উন্মুখ যৌবনের একটা অস্থির ক্ষুধার নেশায় তাহার মাথার ভিতরটা সহসা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। সম্মুখের বিরাট যন্ত্রের অবিরাম ঘর্ঘর ধ্বনি সহসা তাহার মনের ভিতরেই যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ডুবিয়া গেল। এই সর্বপ্রথম তাহার জিহ্বা অসংযত হইয়া উঠিল, আগ্রহ ভরে বলিল, আছে আছে মনুয়া তুই চেয়ে দেখলে দেখতে পাস—বলিয়া সে উঠিয়া আসিয়া মনুয়ার কপালের উপর হইতে অসংবদ্ধ চুলগুলো সরাইয়া দিয়া ডাকিল, মনুয়া—

মুখ তুলিতেই মনুয়া চমকিয়া উঠিল। সরযূর উজ্জ্বল মুগ্ধ চক্ষু দুইটার মধ্য হইতে যৌবনের একটা উগ্র ক্ষুধা ফাটিয়া পড়িতেছে। অস্ফুট স্বরে সে বলিল, কি রে ?

তোর কি বিশ্বাস হয় না ?

কাকে ?

আমাকে ?

না না তুই যা, আমায় আর জ্বালাসনে সরযূ, যা—বলিয়া চঞ্চল চরণে মনুয়া সে নির্জ্জন স্থানটা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে অগণন সহকর্ম্মীর ভিতর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বৈকাল বেলায় কলের ছুটি হইল। লোকজন কুলি মজুর দলে দলে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। ছেলে কাঁকালে করিয়া অসংখ্য কুলী রমণী চাল ডাল নুন তেল মসলা প্রভৃতি কিনিয়া লইল। পুরুষগুলা কাঠ মাথায় করিয়া গজল ভাঁজিতে ভাঁজিতে চলিল।

যখন সকলে বাহির হইয়া গিয়াছে, এমন কি ঝাড়ুদারেরা পর্যন্ত আপনাদের কর্তব্য সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়া গেল, সেই সময় মনুয়া ধীরে ধীরে ফটকের বাহিরে আসিল। ঘরের রান্না চড়াইবার জন্য কি কি কিনিয়া লইবে তাহা একবার মনে মনে মিলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল কিন্তু ভাল লাগিল না। দীর্ঘরাত্রি ধরিয়া সেই অন্ধকার ঘরখানায় পড়িয়া থাকিতে আজ তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল, তাই সহসা কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া সে পশ্চিম-দিকের ফটকের ধার দিয়া গঙ্গার ধারে আসিয়া পড়িল।

গ্রামের সন্ধ্যা-সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার লাল আভা তখনও জলের উপর চক্‌চক্‌ করিতেছিল। গঙ্গার একূল ওকূল দেখা যায় না—দুই পাশের অস্পষ্ট বনস্পতির ভিতর দিয়া কেবল বহুদূর বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। মনুয়া একটা উঁচু পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে নামিয়া আসিয়া একেবারে জলের কাছে একটা পাথরের ঢিপিতে হেলান দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। জলের ঠিক উপরে একখণ্ড চতুর্থীর চাঁদ উঠিয়াছে, তাহারই নীচে দিয়া একসারি বক উড়িয়া যাইতেছিল। নিকটে দূরে জনমানবের

চিহ্ন নাই, কেবল অল্পক্ষণ পূর্বে যে একটা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যাইতে-ছিল, তাহা যেন নিকটে আসিতেছে বোধ হইল।

মনুয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে তাহারা নিকটে আসিতেই মনুয়া দেখিল, লাদু ও বাতাসী পরস্পর গলা ধরিয়া খল্‌খল্‌ করিয়া হাসিতেছে। এত হাসির কারণ বুঝিতে মনুয়ার দেরী হইল না। আজ তাড়ি খাইবার দিন, দুজনে তাহাই খাইয়া আসিয়াছে! কিন্তু উহাদের ঐরূপ আত্মবিস্মৃত উচ্ছৃঙ্খল ভাব দেখিয়া মনুয়ার সর্বাঙ্গে যেন বিষের জ্বালা ছড়াইয়া দিল। উঠিয়া চলিয়া যাইবে ভাবিল, কিন্তু লাদু যে ইহা এতদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছে তাহাই দেখাইয়া দিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল এবং তাহারই একটা অবসর খুঁজিয়া লইয়া সে রাগের জ্বালায় ফুলিতে ফুলিতে নিকটে গিয়া বলিল, লাদু একি? লাদু ভাবে নাই এই সন্ধ্যাবেলা মনুযা এখানে বসিয়া আছে। সহসা সম্মুখে সাপ দেখিয়া লোকে যেমন ভয়ে চমকিয়া উঠে সেও তেমনি উঠিল, কিন্তু ভয় চাপিয়া বলিল, কি, তুই কোথা হতে এলি মনু? তাহার নেশা ছুটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

যেখান হতেই আসি—তোর এসব কি?

কোন সব,—এতে কি দোষ?

কি দোষ! তুই বাতাসীকেও নষ্ট কচ্ছিস?

বাতাসীর সম্মুখে এ অপমানকর মন্তব্যে লাদু জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, তাতে তোর বাবার কি?

কিছু না—কিছু না, কিন্তু তুই দিব্যি করেছিলি কেন?

বাতাসী বলিল, দিব্যি কিসের লাদু?

রোষে ক্ষোভে মনুয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। ঝঙ্কার দিয়া বলিল, ওই দিব্যি করে আমায় নষ্ট করেছে বাতাসী, তুই সাবধান হ,—ও নেমকহারাম।

রাগে লাল হইয়া লাদু বলিল, এই সাবধান মনুয়া, এখনি তোকে মেরে ফেলে দেবো—

রুদ্ধ কণ্ঠে মহুয়া বলিল, মার্না মার, খুব মার, তোর হাতেই মরব সে ভালই, কিন্তু তুইত জুয়োচোর, নেমকহারাম, বাঠপাড়।

লাদুর আর সহ্য হইল না। ঠাস্ করিয়া তাহার গালে একটা চড় মারিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিল, তার পরেই বাতাসীর বাধা না মানিয়া কীল চড় ঘুষি যে ভাবে পারিল তাহাকে প্রহার করিল। মহুয়া চিৎকার করিতে করিতে বলিল, ওই দিব্যি করে আমায় বিয়ে করবে বলেছিল বাতাসী, ওই হারামখোর, চসম খেগো।

আবার গালাগাল, বলিয়া পুনরায় লাদু একটা লাথি মারিয়া বলিল, আবার তোকে কে চায়—চল বাতাসী, ও হারামজাদী পড়ে থাক এখানে, ওর তিন-দিন মজুরী বন্ধ করে দেব, বলিয়া সে বাতাসীকে একরূপ টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। তাহার এইরূপ নির্মম ব্যবহারে এই নির্য্যাতিতা তরুণী যে এইখানে একটা কিছু অসম্ভব ঘটনা ঘটাইতে পারে তাহা মুহূর্তের তরেও সে ভাবিয়া দেখিল না।

মহুয়া উঠিয়া বসিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল। মার খাইয়া চোখ দুইটা, মুখখানা ফুলিয়া উঠিয়াছে, দেহের ভিতর বাহিরে একটা প্রচণ্ড জ্বালা ধরিয়াছিল। সম্মুখে দুকূলপ্লাবী গঙ্গার জলের উপর ম্লান চাঁদের আলোটা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। নিকটে দূরে জন মানবের সাড়া শব্দটি নাই। সহসা তাহার ঘাড়ে ভূত চাপিয়া গেল; উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুহূর্তে কাপড়খানা সামলাইয়া লইল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই তাহার অচৈতন্য দেহটা জলের ধারে পড়িয়া গেল! জোয়ারের জল আসিয়া তাহার কাপড়খানাকে ভিজাইয়া দিল।

ভোরের আলোর আভাসটুকু যখন চিক্ চিক্ করিয়া সরযূর জানালার ফাঁক দিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন মহুয়ার জ্ঞান হইল। চাহিয়া দেখিল সরযূর কোলে মাথা দিয়া সে শুইয়া আছে এবং সরযূ আকুল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, আমায় কখন তুল্‌লি সরযূ? সরযূ চোখের জলটা মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, তখনই। ওইদিকে তোকে খুঁজতে এসেছিলুম কিন্তু আর দুঃখ দিস্‌না মন্নু ভাই, একবার মুখের কথা বল্‌।

মন্নুয়া চুপ করিয়া রহিল, একটু পরে বলিল, তুইও ত পুরুষ মানুষ সরযূ, তুইও ত এর পর আবার পায়ে মাড়িয়ে চলে যাবি।

তোর পায়ে পড়ি মন্নু, ওকথা আমায় বলিস্ না।

মন্নুযা পুনরায় বলিল, তুইও ত দুদিন পরে ফিরেও চাইবি না সরযূ। সরযূ আনন্দের আবেগে বলিয়া উঠিল, কিন্তু এখানে লাদুর তাঁবে আর থাকব না মন্নু,—চল আমরা আজই চলে যাই, যেখানে যাব, দুজনে গতর খাটিয়ে খাব।

মন্নুযা তাহার কোলের ভিতর মুখ লুকাইযা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, তাই চল সরযূ, তাই চল। এ জায়গাটা ভাল নয—বলিতে বলিতে তাহার নিমীলিত দৃষ্টি হইতে কয়েক ফোঁটা জল গড়াইযা পড়িল।

বিজয়িনী।

যুক্তপ্রদেশের উত্তরে হিমালয়ের একটি বিশাল উপত্যকা। সেখানে প্রাকৃতিক কারণে অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টির ফলে চাষীগণ অনেক সময়ে মালিকগণকে বাৎসরিক খাজনা পরিশোধ করিতে পারিত না। এই লইয়া গ্রামের স্ত্রী-পুরুষগণকে অনেক সময়ে তালুকদারের হাতে লাঞ্ছনা ও পীড়ন সহ্য করিতে হইত। গ্রামবাসীগণ ইহার প্রতিকার করিত না, তাহাদের ভাগ্যের প্রতি ইহাই ঈশ্বরের নির্দেশ মনে করিয়া মাথা হেঁট করিয়া থাকিত।

একজন ক্ষত্রিয় চাষীর কন্যা, তাহার নাম সত্যবতী, এইরূপ আবেষ্টনের মধ্যে মানুষ হইয়া উঠিতেছিল। সে ঘোড়ায় চড়িত, পুরুষের বেশে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া তীর ধনুকের ব্যবহার শিক্ষা করিত, দল বাঁধিয়া তীর্থযাত্রী-গণকে আক্রমণ করিয়া অর্থ ও সম্বল লুণ্ঠন করিয়া পলাইতে আনন্দ পাইত। চঞ্চল, নিষ্ঠুর ও সরল মেয়ে ছিল সত্যবতী; সে ছিল অনেকটা পার্বত্য প্রকৃতির, তাহার আচরণ ছিল বন্য ও দুর্বার।

গ্রীষ্মকাল। মহালের খাজনার কিস্তি আদায় করিবার জন্য তালুকদার লোকজন লইয়া গ্রামে আসিয়াছে। যাহারা খাজনা দিতে পারে নাই তাহাদের উপর অত্যাচার চলিতেছে। কাহারও ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া হইতেছে, কাহারও কুটীরে বন্য হস্তীকে ছাড়িয়া দিয়া কুটীরবাসী চাষীগণকে উৎখাত করানো হইতেছে। গ্রামবাসীগণ উচ্চকণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া দিক্‌বিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। অত্যাচারের প্রতিবাদ কেহ করে।

উপত্যকা হইতে দূরে পার্বত্যপথ বাহিয়া সত্যবতী ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছিল। তাহার নিকট এক বণিকের লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার। মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সঙ্গীগণের সাক্ষাৎ নাই, তাহারা ভিন্ন পথ ধরিয়া পলাইয়াছে। সত্যবতী ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়া এক পাইন বনের ছায়ায় ঘোড়া বাঁধিয়া বিশ্রাম করিতে বসিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভারের থলিটি খুলিয়া সে কৌতূহলে ও বিস্ময়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সভ্য জগতের সহিত এবং বিচিত্র

মণিহারি দ্রব্যের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। কতকগুলি সুন্দর বস্ত্র, প্রসাধন ও সুগন্ধী দ্রব্য, নানারূপ খেলনা ও পুতুল, জরির ফিতা, চিরুনী, আংটি ইত্যাদি। আর একটি বস্তু দেখিয়া সে আকৃষ্ট হইল, সেটি আয়না। আয়নায় নিজের মুখ ও রূপ দেখিয়া সে স্তব্ধ হইল, শিহরিয়া উঠিল। আজ সে আবিষ্কার করিল যে, সে স্ত্রীলোক, সে রূপবতী, অপরিমেয় তাহার যৌবন। সত্যবতী দিগন্ত প্রসারিত পাইন অরণ্যের দিকে চাহিয়া কাঁদিল, উপরের আকাশ যেন তাহারই রূপে, তাহারই যৌবন-ব্যাকুলতায় ঝলসিয়া যাইতেছে। এই মনে করিয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান করিয়া বেড়াইল।

গ্রামে তালুকদারের অত্যাচার চলিতেছিল, এমন সময় সেখানে অশ্বারোহণে সত্যবতী আসিয়া হাজির হইল। গ্রামের লোক তাহার অপূর্ব পরিচ্ছদ দেখিয়া স্তম্ভিত, তালুকদারের পাইক, পেয়াদা, লোকজন সত্যবতীর মোহিনী মূর্তি দেখিয়া বিস্ময় বিমূঢ়। সত্যবতীর হাতে বর্শা, মাথায় ময়ূরের পালক, ললাট জরির অলঙ্কারে ঝলসিত, হাতে কঙ্কণ, কণ্ঠে মুক্তার মালা। লুণ্ঠিত বণিকের প্রসাধন-সামগ্রীতে সে সুসজ্জিতা।

সত্যবতী যুদ্ধ ঘোষণা করিল। হাতে বর্শা লইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া সে গ্রামের দরিদ্র ক্লিষ্ট নরনারীকে উত্তেজিত করিল। বলিল, কে আছ বীর, কে আছ বীরাঙ্গণা, হিংসার পদতলে আত্মবলি দাও, মদমত্ত বর্বরতাকে অস্বীকার করো, মৃত্যুকে মেনে নাও, পরাজয় স্বীকার করো না।

তাহার বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া দরিদ্র, দুর্বল, পদদলিত ও সর্বহারার দল মৃত্যুপণ করিয়া সত্যাগ্রহ করিল।

অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত বলিষ্ঠ সংহত শক্তি দেখিয়া তালুকদারের পক্ষ প্রমাদ গণিল। হাসিমুখে যাহারা মৃত্যুবরণ করে তাহারা ভয়ঙ্কর।

রাজসরকারে সংবাদ গেল। পুলিশ ফৌজ আসিল। গ্রামে সিপাহী পাহারা বসিয়া গেল।

সত্যবতীর পিতার নিকটে আসিয়া পুলিশ জানাইল, সত্যবতীকে সাক্ষ্য

দিতে হইবে। সত্যবতী সেদিন গ্রামের মঙ্গল মানৎ করিয়া দূর চন্দ্রা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল, তাহার কিছু ভাবান্তর ঘটিয়াছে, ভিতরের সুপ্ত নারীত্ব জাগ্রত হইয়াছে।

স্নানান্তে সিক্তবস্ত্রে আসিতে আসিতে সে গুণ গুণ করিয়া পাহাড়ী গান গাহিতেছিল। এমন সময় বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া সে চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিল। দেখিল একটা হাঁস পাখা ঝটাপটি করিয়া নদীর চড়ার উপর পড়িল। সে ছুটিয়া গিয়া হাঁসটাকে তুলিল। গুলির আঘাতে পাখীটির পাখা ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু মরে নাই। সত্যবতী তাহার সিক্ত বস্ত্র নিংড়াইয়া হাঁসটাকে স্নান করাইল।

সহসা পিছন ফিরিয়া দেখিল এক রূপবান যুবক দাড়াইয়া,—তাহার হাতে বন্দুক।

সত্যবতী কহিল, কে তুমি?

আমি সুরযকিরণ।

কেন মেরেছ তুমি এই নিরপরাধ পাখীকে?

সুরযকিরণ বলিল, যে দুর্বল সেই মরে, তার স্থান পৃথিবীতে নেই। আমার শিকার ফিরিয়ে দাও।

সত্যবতী কহিল, দেবো না, অন্যায় করতে তোমাকে দেবো না।

না দিলে জোর ক'রে নেবো।

হাঁসটাকে লইয়া সত্যবতী উঠিয়া দাড়াইল। বলিল, আগে আমাকে মারো, আমার বুকে বিঁধিয়ে দাও তোমার গুলী, তার আগে আমি দেবো না। নিষ্ঠুর, উৎপীড়িতের দীর্ঘশ্বাসে তোমার পাপশক্তি যে একদিন চূর্ণ হয়ে যাবে, জানো না?

সত্যবতী কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরযকিরণ তাহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইল। বলিল, কে তুমি?

আমি সত্যাগ্রহী সত্যবতী, ক্ষত্রিয় কন্যা। যারা দুর্বল তাদের রক্ষা করাই আমার ধর্ম।

সামান্য একটা পাখীর প্রতি তোমার এই ভালোবাসা কেন, সত্যবতী ?

এই পাখী আমার দরিদ্র দুর্বল দেশের প্রতিমূর্তি। যারা আঘাত করে তারা জানে না, যারা আঘাত সহ্য করে তারাই জানে দুঃখীর প্রাণের ব্যথা।

সুরযকিরণ বলিল, সবল দুর্বলের সমস্যা জগতে চিরকাল রয়েছে। তুমি কেন নিজের জীবন নষ্ট করবে এই সমস্যায় ? তোমার কি আর কোনও কামনা নেই ?

সত্যবতী সুরযকিরণের দিকে চাহিল।

সুরযকিরণ পুনরায় বলিল, শক্তিমান ও দুর্বল, জীবন ও মৃত্যু, সংহার ও সৃষ্টি—এরা পৃথিবীর আদিম নিয়ম। এই নিয়মের প্রবাহে তুমি যাবে ভেসে ? তুমি ছুটবে লক্ষ্যহীন আদর্শের পিছনে পিছনে ? তোমার জীবনের সার্থকতা কি, সত্যবতী ?

তোমার কথা আমি বুঝিনে।

এই আগম-নিগম, এই জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানে যে বস্তু অমরত্ব লাভ করে তার খোঁজ কি তুমি জানো না ?

সত্যবতী চারিদিকে চাহিল। ভয়-কম্পিত কণ্ঠে বলিল, না।

তার নাম প্রেম, প্রেম সকল বস্তুকে অমরত্ব দান করে। আবার সেই একই বস্তু ব্যক্তিগত জীবনে সার্থকতা খোঁজে। তোমার এই বয়স, এই রূপ, এই যৌবন—

সত্যবতী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

সুরযকিরণ বলিল, ওকি, আমার শিকার ফিরিয়ে দিলে না ?

সত্যবতী ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, কি করবে তুমি একে নিয়ে ?

সুরযকিরণ হাসিল। বলিল, সুস্বাদু মাংস ভোজনে আনন্দ।

সত্যবতী শিহরিয়া উঠিল। বলিল, নিষ্ঠুর, আমার প্রাণ থাকতে ওকে আমি দেবো না।

আচ্ছা, আমি যদি ওকে না মারি ?

তোমাকে বিশ্বাস করিনে !

শপথ করছি।

তবে দিতে পারি। এই নাও।

হাঁসটাকে হাতে লইয়া সূরযকিরণ বলিল, এই পাখীর প্রাণের বিনিময়ে তুমি প্রাণ দিতে চেয়েছিলে, এর জীবনের বিনিময়ে তুমি কী দিতে পারো সত্যবতী?—এই বলিয়া সূরযকিরণ অগ্রসর হইল।

আমি চাষীর কন্যা—সত্যবতী কম্পিত, মুগ্ধ ও জড়িত কণ্ঠে কহিল, আমি দরিদ্র, তোমাকে কী দেবো?

অভিভূত সূরযকিরণ নতজানু হইয়া বলিল, ভিক্ষা দাও, অন্নপূর্ণা?

সত্যবতী আর দাঁড়াইল না, পিছন ফিরিয়া দৌড়াইবার চেষ্টা করিল। সেই মুহূর্তে একটি ছোট ঘটনা ঘটিল। তাহার সিক্ত বস্ত্রের মধ্যে কোথায় ছোট কাঠের আয়নাটি লুক্কায়িত ছিল তাহা পড়িয়া গেল। সত্যবতী থমকিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। চারিচক্ষে দুইজনে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর দ্রুতপদে সে পলাইয়া গেল।

সূরযকিরণ আয়নাটি তুলিয়া এবং বুকের কাছে আহত হাঁসটাকে লইয়া তাঁবুর দিকে ফিরিয়া গেল।

সত্যবতী জানিত না সূরযকিরণই স্বয়ং তালুকদার। পরদিন দেখা গেল, পুলিশ ফৌজ বিদায় লইতেছে, গ্রামবাসীরা সত্যবতীকে লইয়া জয়োৎসব করিতেছে, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা কানাকানি করিতেছে। তালুকদার খাজনা ছাড়িয়া দিয়াছে, গ্রামের উপর অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ করিতেছে, অনেককে আসবাব ও উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করিবার জন্য কিছু কিছু অর্থও দেওয়া হইতেছে।

সকলেই অহিংস সত্যাগ্রহের জয় ঘোষণা করিল। সত্যবতীকে গ্রামের দেবী বলিয়া মানিল।

অশিক্ষিত মূঢ় জনসাধারণ যে তালুকদারকে অভিশম্পাৎ না দিয়া জলগ্রহণ করিত না, তাহাকেই পরম দয়ালু বলিয়া পূজা করিল। অত্যাচার উৎপীড়নের

কথা ভুলিয়া গেল। তালুকদারের লোকজন যে যাহার গন্তব্যস্থলে চলিয়া যাইতে লাগিল। সুরযকিরণ শিকারের অছিলায় দুইজন সঙ্গীকে লইয়া নদীর পরপারে তাঁবু ফেলিয়া রহিয়া গেল। গ্রামের লোক নানারূপ উপঢৌকন লইয়া প্রায়ই তাহাকে দেখিয়া যাইতে লাগিল।

বিরহিণী সত্যবতী এ সকল কিছু জানিল না। সে সুরযকিরণকে ভালো-বাসিয়াছে, তাহার কথা ভাবে, সুখ চিন্তা করে, গান গায়। সঙ্গিনীগণকে ছাড়িয়া একা একা ঘুরিয়া বেড়ায় পাহাড়ে পাহাড়ে, অরণ্যে অরণ্যে।

এমন সময় এক বিপত্তি ঘটিল। সেই লুণ্ঠিত বণিক সহসা পুলিশ পেয়াদা লইয়া গ্রামে চড়াও হইয়া সত্যবতীকে গ্রেপ্তার করিল। গ্রামের লোক বাধা দিল না, প্রতিবাদ করিল না, বরং অনেকেই ডাকাতির অপরাধে সত্যবতীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিল। সত্যবতীর পিতামাতা ঘরে ঘরে গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু রাজ সরকারের ভয়ে সকলে তাহাদের তাড়াইয়া দিল। যাহাকে এই সেদিন তাহারা দেবী বলিয়া পূজা করিয়াছে আজ বিপদের দিনে গ্রামবাসীরা তাহার কোনো মূল্যই দিল না।

সত্যবতী যাইবার সময় কাঁদিয়া প্রার্থনা করিল, ঈশ্বর এদের অপরাধ নিয়ো না, দরিদ্র এরা, মনুষ্যত্বহীন। অশিক্ষায় এরা মূঢ়—এদের তুমি ক্ষমা করো।

সমস্ত গ্রামবাসীরা দাঁড়াইয়া দেখিল, পুলিশ পেয়াদা সত্যবতীকে লইয়া গ্রামের বাহিরে উপত্যকা অতিক্রম করিয়া দূর হইতে দূরান্তরে লইয়া গেল।

সত্যবতীর বৃদ্ধ পিতা তুলসীরাম বুক চাপড়াইয়া বলিল, হায়রে ক্রীতদাসের জাতি, হায় জনসাধারণ!

তাঁবুতে আসিয়া অনুচর সুরযকিরণকে সংবাদ দিল, সত্যবতীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতেছে। সে ধরা পড়িয়াছে।

ঘোড়ায় চড়িয়া প্রান্তর ও পর্ব্বত পার হইয়া সুরযকিরণ ছুটিল। অনুচরগণ সঙ্গে চলিল।

পুলিশ ফৌজকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সুরযকিরণ তাহাদের থামাইয়া বলিল, এই, খবরদার। আমার গ্রাম থেকে কে মেয়ে চুরি করে নিয়ে যায়?

সত্যবতীর উপর বনিকের একটু লোভ হইয়াছিল। সে বাহির হইয়া বলিল, মেয়ে ডাকাতকে আমরা ধরেছি।

খবরদার, সবধান।—বলিয়া সুরযকিরণ নিজের পরিচয় দিল। বলিল, আমি তালুকদার, কতটাকা জামিন চাও, বলো ?

সুরযকিরণ আসিয়া সত্যবতীর পাশে দাঁড়াইল। সত্যবতী বিস্মিত, স্তম্ভিত হতচকিত। দেখিল, সেই অত্যাচারী তালুকদার স্বয়ং সুরযকিরণ।

পুলিশের কর্তার হাতে নিজের নামে ও পরিচয়ে দলিল সই করিয়া প্রচুর পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া সুরযকিরণ সত্যবতীকে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার করিল। বনিকের যে সম্পদ্ ও অর্থ ক্ষতি হইয়াছে তাহার বহুগুণ বেশি তাহাদের হাতে আসিল।

পুলিশের কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন, এই মেয়ে তোমার কে ?

প্রশ্ন শুনিয়া প্রণয়ী ও প্রণয়ীণী পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। সুরযকিরণের কাতর দৃষ্টি, সত্যবতীর দৃষ্টি ব্যাকুল ও বিহ্বল।

প্রশ্নকর্ত্তা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, এ মেয়ে তোমার কে ?

সত্যবতী সামাজিক অপমানের ভয়ে সহসা সুরযকিরণকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিল। সুররযকিরণ বলিল, এ আমার স্ত্রী !

আকস্মিক উত্তেজনায় যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা সত্য নয়। দুইজনে তাঁবুতে ফিরিয়া দেখিল, দুইজনের মধ্যে অপরিমেয় ব্যবধান। কে বলিল তাহারা স্বামী-স্ত্রী ? মিথ্যা কথা। যাহাকে অত্যাচারী, রক্তপিপাসু, বর্বর বলিয়া সত্যবতী জানিয়া আসিয়াছে, সেই অসুর তালুকদার তাহার স্বামী ? মিথ্যা কথা। সেদিন নদীর ধারে দাঁড়াইয়া এই লোকটার জন্যই তাহার হৃদয়-দৌর্বল্য দেখা দিয়াছিল, ইহা অতিশয় ক্ষোভের কথা। না, এই বর্বরকে সে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিবে না।

সুরযকিরণ বলিল, ভয় করো না আমাকে। নিষ্ঠুর, কিন্তু কাপুরুষ নই। কাছে এসো, ওই হ্যাখো, তোমার সেই হাঁস, ওকে আমি বাঁচিয়ে রেখেছি। কথা বল্‌ছ না যে ?

সত্যবতী বলিল, আমাকে ছেড়ে দাও।

সবিস্ময়ে সূরযকিরণ বলিল, ছেড়ে দেবো? পুলিশসাহেবকে আমি কি বলেছি মনে আছে?

সত্যবতী বলিল, তুমি অত্যাচারী, বলদর্পী, দরিদ্রের বুক ভেঙে দেওয়া তোমার কাজ। আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

তাহার উত্তেজনা দেখিয়া সূরযকিরণ হাসিল। বলিল, আমি অত্যাচারী বটে কিন্তু কার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে হাঁসটাকে মারবো না? আমি কি সত্য পালন করিনি? তুমি জানো জীবনে এমন বহু ঘটনা ঘটে যা মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায়? সত্যবতী, তোমার এই ধর্মটা কেমন? বিপদে প'ড়ে তুমি আমার শরনাপন্ন হয়েছিলে, এখন মুক্তি পেয়ে আমাকে অপমান ক'রে যেতে চাও? এই কি ক্ষত্রিয় কন্যার ধর্ম?

সত্যবতী বলিল, সত্যই আমার ধর্ম। আমি সত্যবাদিনী, তোমাকে ঘৃণা ক'রে এসেছি, তোমাকে চিরদিনই ঘৃণা করব।

সূরযকিরণের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, নিকটে আসিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল, আমিও সত্যপালন করবো, তোমাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করেছি, প্রেমের দ্বারা তোমাকে জয় করবো।

শক্তি প্রয়োগ করবে?

প্রেমের শক্তি সকলের বড়।

তুমি নির্মম, তুমি মনুষ্যত্বহীন, তোমার হিংসার পথে পথে রক্তের দাগ, তোমার প্রেম কোথায়? যদি বলপূর্বক আমাকে নিয়ে যাও তবে কেবল পাবে আমার প্রাণহীন দেহ, প্রেমহীন জীবন। তোমার ঐশ্বর্যের অহংকারের মধ্যে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না, তোমার মদমত্ততার পায়ে আমাকে দাসখৎ লেখাতে পারবে না, আমার যোগ্য হওয়ার সাধনা তোমার নেই। সত্যবতী চলিয়া যাইতেছিল।

দাঁড়াও যেয়ো না। তোমার যোগ্য হওয়ার জন্য কী করতে হবে?

তপস্যা করো, তবে এই প্রশ্নের উত্তর পাবে। আমি চললাম।

সত্যবতী চলিয়া গেল, তাহাকে বাধা দিবার সাহস সুরষকিরণের ছিল না। কেবল পিছনে পিছনে আসিয়া বলিল, যে গ্রামবাসীরা তোমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল আবার তাদের কাছেই ফিরে চলেছ ?

তারা অজ্ঞান তবু তারা আপন মানুষ।—এই বলিয়া সত্যবতী দর্পভরে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে লোকমুখে নানা কথা শুনিয়া গ্রামবাসীরা সত্যবতীর নামে কলঙ্ক রটনা করিয়াছে। পুলিশের হাতে পড়িয়া তাহার জাতি নষ্ট হইয়াছে,—তালুকদারদের তাঁবুতে গিয়া সে নারীধর্ম বিসর্জন দিয়াছে।

সমাজপতি, পণ্ডিত, শাস্ত্রী, গ্রামের প্রধান নরনারীগণ তাহাকে গালি দিল, সমাজচ্যুতি করিল। সত্যবতীর পিতামাতার উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিল।

সুরষকিরণ তাহার খাস মহলে ফিরিয়া গেল। তাহার জীবন সত্যবতীর অভাবে বিস্বাদ বোধ হইল। ধনসম্পদের প্রতি তাহার মোহ হ্রাস পাইতে লাগিল। সে দান খয়রাতের দিকে মন দিল। জীবনে তাহার পরিবর্তন ঘটিল।

তাহার পুরুষানুক্রমিক জড়োয়া জহরৎ, আসবাব সজ্জা, আমানতি অর্থ—একে একে সমস্ত বিক্রয় করিয়া প্রজাগণের হিতার্থে সাধারণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ব্যবহারিক জীবনের সকল বিলাসিতাকে বিসর্জন দিল। একমাত্র পুত্রের এইরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বিধবা বৃদ্ধা মাতা অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন।

বন্ধুরা আসিয়া তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সুরষকিরণ বলিল, ভালো লাগে না।

তুমি নিজের এরূপ সর্বনাশ কেন করছ ? পিতৃপুরুষের সকল সম্পদ তুমি কেন নষ্ট করছ ? কী চাও তুমি ?

সুরযকিরণ বলিল, ঐশ্বর্যের অহংকার চূর্ণ হোক, এই আমি চাই। আমি চাই খ্যাতিহীন পরিচয়হীন জীবন—আমি চাই আমার সকল সম্পদ যেন সর্বসাধারণের সেবায় লাগে।

তুমি একথা জানো, সর্বসাধারণের সেবা যারা করে তারা ধনী, ভিখারী নয়? ভিখারীর ত্যাগও নেই, সেবাও নেই—তারা লক্ষ্মীছাড়া!

বন্ধুদের যুক্তি সুরযকিরণ মানিল না। বিধবা মাতার জন্য যৎসামান্য রাখিয়া সে যথাসর্বস্ব জনহিতার্থে বিলাইতে লাগিল। ইহাতেও হইল না, একদিন সে তাহার প্রিয় অনুগত ভৃত্য মহাদেওকে লইয়া পথে বাহির হইল। রাজপুত্র পথের ভিখারী হইয়া চন্দ্রা নদীর ধারে গিয়া কুটির বাঁধিল। সেই হাঁসটিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। এই রাজহংস তাহাকে নবজীবনের বার্তা আনিয়া দিয়াছিল। এই হংস তাহাকে ভালোবাসিতে শিখাইযাছে, ইহা যেন তাহাদের উভয়ের প্রেমের সেতু। সুরযকিরণ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়; কিছু ভালো লাগে না। নদীর ধারে গিয়া বসে, জোৎস্না রাত্রে বাঁশী বাজায়।

ওদিকে বহু অত্যাচার করিয়াও গ্রামের লোক খুশি হইল না। একদিন তাহারা সত্যবতীর ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল। বৃদ্ধ পিতাকে সে বাঁচাইতে পারিল বটে কিন্তু বৃদ্ধা মাতাকে সে লেলিহান অগ্নিশিখার গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে পারিল না। সব পুড়িয়া ছারখার হইল।

সত্যবতী পিতার হাত ধরিয়া পথে নামিয়া আসিল। আগুনের ঝলকে তাহার পিতার চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

হিমালয়ের এক তীর্থপথে মেলা উপলক্ষ্যে মহাদেওকে সঙ্গে লইয়া সুরয-কিরণ গিয়াছিল। ফিরিবার পথে দেখিল, এক অন্ধ ভিখারীর হাত ধরিয়া একটি ছিন্নবাসপরিহিতা তরুণী গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে। ভিক্ষা দিতে গিয়া অকস্মাৎ সুরযকিরণ সত্যবতীকে চিনিতে পারিল। চারি চক্ষের মিলন হইল। সত্যবতীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

পথের মাঝখানে নতজানু হইয়া বসিয়া সুরযকিরণ অঞ্জলী পাতিয়া বলিল, দেবি, আজ আমাকে ভিক্ষা দাও।

সত্যবতী তাহার দুই হাত ধরিয়া তুলিল। বলিল, আমার দরিদ্র দেশকে তোমার হাতে দিলাম, তুমি তার দুঃখ ঘোচাও।

বিবাহের সংবাদ প্রচারিত হইল। দরিদ্র নারায়ণ দলে দলে আসিল। দূর দূরান্তের গ্রাম হইতে দরিদ্র দুঃখী প্রজাদল আসিয়া উৎসবে যোগ দিল। যাহারা কলঙ্ক রটাইয়াছে, অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়াছে, ঘর জ্বালাইয়াছে, —তাহারাও আসিল।

উৎসবে সবাই মত্ত। এমন সময় স্বামী স্ত্রী চন্দ্রানদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যবতীর কোলে সেই প্রিয় রাজহংস। একদিন এই হংস আপন রক্ত দিয়া তাহাদের মিলনের পথে সাহায্য করিয়াছিল, এখন তাহার ক্ষতস্থান নিরাময় হইয়াছে, সে উড়িতে পারে।

সুরযকিরণ বলিল, ওকে উড়িয়ে দাও, অসীম বিশ্বের দিকে গিয়ে আমাদের এই মিলনের সংবাদ প্রচার করুক।

সত্যবতী হাসিয়া সেই রাজহংসকে জ্যোৎস্নালোকে উড়াইয়া দিল। দুইজনে সেইদিকে চাহিয়া রহিল, দেখিল, আকাশের বহুদূর পর্যন্ত উড়িতে উড়িতে সেই রাজহংস পুনরায় তাহাদের কুটিরের লতা-বিতানের ধারে আসিয়া বসিল। তাহাদের মুখে হাসি ফুটিল।

রুক্মিণী ঃ

নিস্তব্ধ কয়েকটি মুহূর্ত, নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত নাই। সেই মুহূর্তগুলি যেন দরজার বাহিরে ধূম ও কুয়াসা জড়ানো শীতের রাত্রির মতই অসার; নির্বাক আর ভয়ঙ্কর। রাজপথে লোক চলাচল থামিয়া গিয়াছে, পাথরের উপর দিয়া লোহার চাকার চলমান অর্তনাদ আর শোনা যায় না। আলোগুলি মুমূর্ষু রোগীর চক্ষুর মত স্তিমিত হইয়া রহিয়াছে।

বলিলাম, তোমার জন্য এসেছি।

গলিপথের এক দরজায় উঠিয়া মেয়েটি কহিল, ঘরে এসো। বলিয়া হাসিল।

ঘরের দরজায় আসিয়া বলিলাম, তোমার জন্যে এসেছি, তোমার নাম রুক্মিণী তো?

এখন ও নামটা বদ্‌লেছি; আমার নাম রোহিণী। তুমি কেমন ক'রে জানলে আমার নাম?

উত্তর দিলাম না, কেবল হাসিলাম। আমার চোখের দৃষ্টি আলোর শিখার মত কাঁপিতেছিল, দেবমন্দিরের দূরে ভক্তের হৃদয়ের মতো থর থর করিতেছিল। বছরের পর বছর পথে পথে ঘুরিয়া আজ এই রাত্রে তাহার সন্ধান পাইয়াছি, আমার উল্লাস প্রকাশ করিবার আর শক্তিও নাই। কিন্তু সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, তুমি কি পিছু পিছু আস্‌ছিলে?

বলিলাম, হ্যাঁ।

আমাকে কেমন করে চিন্‌লে?

বলিলাম, আমি তোমাকে চিনি, অনেক কাল থেকে চিনি। মনে পড়ে তুমি বাগবাজারে ছিলে তোমার সেই স্বামীর সঙ্গে?

রুক্মিণী বলিল, স্বামীর সঙ্গে! ও, ছিলুম, ছিলুম, সেই সাধুর আশ্রমের পাশের বস্তিতে। তুমি বুঝি তখন থেকে জানো আমাকে?

বলিলাম, আমি সেই সাধুর আশ্রমে যাতায়াত করতাম। রুক্মিণী, তুমি আমাকে এখনো চিন্‌তে পারোনি?

রুক্‌মিণী আলোটা লইয়া আসিল, তারপর আমার মুখের উপর তুলিয়া অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিল, তারপর কহিল, না, চিন্‌তে পারছি না, কে তুমি ?

বলিলাম, তোমাকে দেখতুম রাস্তার কলে স্নান করতে, কী রূপ তোমার! কী স্বাস্থ্য! তোমার রাঙা মুখ আর শাদা শরীর উঠতো ভিজে মলমলের শাড়ি দিয়ে, তোমার সুগোল সুন্দর হাতের তালে তালে আমার বুকের রক্তে লাগতো দোলা। রাত্রের ধাঁধাঁ নয়, মদের নেশা নয়, ভক্তের ফাঁকা উচ্ছ্বাস নয়! সূর্য্যের আলোয়, সকালবেলা, রাজপথে, লোকজনের সমারোহের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখতুম তোমাকে। কী রূপ তোমার!

রুক্‌মিণী আবার আমাকে একবার লক্ষ্য করিল, কিন্তু বুঝিলাম, অনেক চেষ্টা করিয়াও সে আমাকে চিনিতে পারিল না।

আমি বলিলাম, আঃ সে কী দিন! আকাশের নীল উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে কাঁপতো আমার প্রাণ! সমুদ্রের তরঙ্গের ওপরে যেমন কাঁপে প্রভাত সূর্য। আমি তোমাকে দেখতাম। ভুলে যেতাম আমি সন্ন্যাসীর আশ্রমের মানুষ, ভুলে যেতাম আমি সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান।

রুকমিণী বলিল, ভেতরে এসে বসো।

এই বসি। রুক্‌মিণী, এবার তোমাকে পেয়েছি বহু সাধনায়, বহু আরাধনায়—এই বলিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া অনর্গল উচ্ছ্বাস করিতে লাগিলাম। তুমি আমার কল্পান্তকালের মেয়ে, তোমার দুই চোখে আমার জীবন আর মৃত্যু, তোমার দুই হাতে আমার সৃষ্টি আর প্রলয়! আ, কী সুন্দর তুমি!—কেন সুন্দর জানো? তোমার চোখে সেদিন ছিল অদ্ভুত শুচিতা, অদ্ভুত সারল্য। আমি স্ত্রীলোক চাইনে, চাইনে পতিতা, আমি চাই তোমাকে। মনে আছে তুমি সেদিন আমাকে কী বলেছিলে?

রুক্‌মিণী বিছানার উপর বসিল। বলিল, মনে নেই তো? বলিলাম, আমার মনে আছে, তোমার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি চোখের পলক। তুমি হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলে, বাবু, তুমি কি আমাকে পছন্দ করেছ?—আ,

রুক্মিনী, তোমার সেই হাসি, সেই তোমার বাহু-লতার আন্দোলন! আমার আর সন্ন্যাসীর আস্তানা ভালো লাগেনি।

রুক্মিণী হাসিয়া আমার হাত ধরিল। কহিল, পাগল। এত মদ খেয়ে এসেছ কেন?

এবার হাসি মুখে বলিলাম, কই, খুব নেশা হয়নি তো?

তোমার চোখ যে লাল?

লাল চোখ তোমার জন্যে। তোমার স্বপ্নে চোগ লাল। তোমার কল্পনায় কালো রাত রাঙ্গা, আমার প্রাণ পদ্ম-রক্তাক্ত।

কতদূর থেকে আস্‌ছিলে সঙ্গে সঙ্গে?

ও, অনেক দূর! চাব বছর ধরে পথ হাঁটছি তোমাকে পাবো ব'লে, তোমার কাছে এসে পৌছবো ব'লে। আজ চার বছর ধরে তোমাকে স্বপ্ন দেখছি, রুক্মিণী।

আলোটা দূরে রাখিয়া আসিল। আলোটা কিছু ক্ষীণ, তাহার দরিদ্র ঘবে বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। কিন্তু আমার রাঙা চোখের ভিতরে অদ্ভুত মোহ, মনোহর আত্মবিস্মৃত স্বপ্ন। আবেশ বিলোপ দৃষ্টিতে আমি রুক্মিণীর দিকে চাহিয়াছিলাম। দেখিলাম, তাহার বাহু, তাহার বিশাল কালো চোখ, তাহার বক্ষের সুডৌল ঐশ্বর্যসম্ভার, তাহার পাথর কাটা কঠিন দেহ।

আমি ভাবিতে পারি না, রুক্মিণী পতিতা। পতিতা বলিয়া তাহাকে মনে করিতে আমার লজ্জা করে। প্রথম যেদিন তাহাকে দেখি, তাহার মুখ ছিল সুন্দর, শুভ্র পবিত্রতা, কৌমার্য্যের বিশ্বজয়ী লাবণ্য—যে লাবণ্য জাগরণে, স্বপ্নে ও চিন্তায় আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিত।

কী দেখছ? রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করিল।

তাহার ললিত কণ্ঠে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলাম। নেশার ঝোঁকে গল্‌গল্‌ করিয়া আমার মুখ দিয়া নির্বোধ অর্থহীন বন্যা বাহিব হইতে লাগিল। ফুলিয়া কাঁপিয়া বলিলাম, দেখছি নিজেকে তোমাব আয়নায়। তুমি আমার প্রিয়তমা। এই আলো সাক্ষী, সাক্ষি ওই অন্ধকার রাত্রি—ফুলের গন্ধে আমার প্রাণের

মন্দির ভরে গেছে। আমার জীবন মরণকে তুমি মুগ্ধ করেছ রুক্‌মিণী, তোমার চোখ আমার আশা আনন্দ। চার বছর! যন্ত্রণা দিয়েছ তুমি, অভিশপ্ত করেছ তুমি, প্রেতের মতো শহরের পথে পথে আমি উন্মাদের চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। রুক্‌মিণী, আমি জানি আমার এই ঐকান্তিক বাসনা যদি ঈশ্বরের দিকে ফেরান যেতো আমি ঈশ্বরকে পেতাম, এই আগ্রহ দিয়ে আনতাম ব্রহ্মাণ্ডকে টেনে; আমি বড হতাম, সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হতে পারতাম; আমার এই কামনা শিল্পীর, বিশ্ববিজয়ী প্রতিভার। কিন্তু সব এনেছি তোমার পায়ের তলায়—আমার প্রেম, আমার ত্যাগ, আমার স্বপ্ন, আমার বাসনা। আঃ, যেদিন তোমাকে খুঁজে পেলাম না সেখানে, কী মনে হ'লো জানো? মনে হ'লো ঐ আলোর পথ ধরে গিয়ে সূর্যদেবের হৃদপিণ্ডটাকে ছিঁড়ে আনি, পৃথিবী বিদীর্ণ করে আনি বাসুকীর আত্মাকে, সাগরকে শোষণ ক'রে নিই, আকাশে আকাশে প্রলয়ের আগুন জ্বালিয়ে বেড়াই।

রুকমিণী তাহার একখানা হাত দিয়া আমার কণ্ঠ বেড়িয়া ধরিল। তারপর বলিল, তুমি আর কোনদিন আসোনি এদিকে?

কেন্ দিকে?

এই ধরো মেয়েদের পাড়ায়?

না রুকমিণী, আমি ঘৃণা করি। আমি ঘৃণা করি এই পাশবিকতাকে, ঘৃণা করি তাদের যারা কুকুরের মতন দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায়। পয়সা দিয়ে কামুকতা চরিতার্থ করা, বীভৎস সম্ভোগের জীবন যাপন করা.........না, না, আমি ভদ্রসন্তান, সে আমি কিছুতেই পারিনে, রুক্‌মিণী।

রুকমিণী কহিল, তুমি যতবড ভাবছো আমি ততবড় নই।

বড় নও তুমি, আমি বলিলাম, কিন্তু তুমি পবিত্র, তুমি যদি অশুচি হও আমার আগুনে পুড়িয়ে তোমাকে খাঁটি করে নেবো। পতিতার ঘরে যারা কেবলমাত্র পতিতাকে খুঁজতে আসে তারা পশু, তারা কামুক, আমি তাদের ঘৃণা করি। আমি এসেছি তোমার মধ্যে সেই মানবীকে আবিষ্কার করতে, যে আমার জ্বলন্ত স্বপ্ন, জাগ্রত আশা, যার মধ্যে পাবো অসীম করুনার ভরা

নারীর মন, স্নেহে আর সেবায় যে নারী চিরসহনশীল, যার মালিন্য নেই ; যার লাল বিলোল কটাক্ষ নেই। তুমিই সেই নারী। অনাঘ্রাত ফুলের মতো ছিল তোমার রূপ, লাবণ্যেভরা তোমার দেহ।

রুক্‌মিণী হাসিতে লাগিল। কবি পুরুষের সকল কালের স্তাবকতা শুনিয়া চতুরা নারী যেমন করিয়া হাসে—এও তেমনি। সাদরে কহিল, এখনো বিয়ে করোনি দেখছি। বিয়ে হ'লে সেরে যেতো। কিন্তু যাক্‌গে, আজ সে কথা ভুলে যাও! তোমারই মতন একজন আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল রাস্তায়, আমি আশ্রয় খুঁজে বেড়িয়েছি পথে পথে।

বলিলাম, তোমাকে আর একদিন দেখেছিলাম, রুক্‌মিণী।

কবে ?

একদিন গাড়ীতে করে যাচ্ছিলে, একটা লোক ছিল সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে গেলাম অনেক দূর। কিন্তু তুমি হারিয়ে গেলে। তোমার আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। আচ্ছা রুক্‌মিণী, তুমি টাকা নাও তো ?

রুক্‌মিণী বলিল, নইলে আমার চলবে কেমন ক'রে ?

কত তোমাকে দিতে হ'বে ?

চার টাকা।

কিন্তু আমি যে এবার থেকে দুবেলা আসবো, আমি যে থাকবো তোমার এখানে ?

তা হ'লে কিছু কম দিয়ো।

রুক্‌মিণী, টাকার কথা কিছু বলো না। আমি লুকিয়ে তোমার বালিশের তলায় রেখে যাবো, যেন ভুলে টাকা ফেলে গেছি। তুমিও যেন হঠাৎ পেয়ে গিয়ে বাক্সে তুলে রাখবে। টাকা, টাকার বদলে তোমাকে পাবো এমন কথা আমাকে ভাবিয়ো না লক্ষ্মীটি।

রুক্‌মিণী বলিল, তুমি যদি না রেখে অম্‌নি চ'লে যাও ?

এমন কথা ভাবতে পারো ? আঃ, সত্যি দেহের ব্যবসা মানুষকে কত ছোট করে। তোমাদেরো মানুষ প্রবঞ্চনা করে যায় ? তারা কি এ কথা

বোঝে না যে নিষ্ফল মাতৃত্ব তোমাদের মধ্যে কেঁদে বেড়ায়? তোমরা যে সকলের বড়! পুরুষের সকল লজ্জা তোমরা বহন ক'রো নিঃশব্দে। রাগো সমাজের স্বাস্থশ্রী!

তুমি চুপ করো।—রুক্‌মিণী বলিল।

বলিলাম, আমি কি জন্যে এসেছি জানো? তোমার কাছে ভালবাসা পাবার জন্য নয়, এসেছি তোমার কাছে আত্মাহুতি দেবো ব'লে। বলো রুক্‌মিণী, আমার ভালবাসা তুমি গ্রহণ করবে?

কী বলছ গো ছেলে মানুষের মতন!

বলিলাম, রুক্‌মিণী, আজ সমস্ত রাত জেগে তোমাকে দেখ্‌ব। আজ দোবো তোমার যোগ্য মূল্য, আজ জানিয়ে যাবো তুমি পতিতা বটে কিন্তু তুমি মেনকা, তুমি উর্ব্বশী, তোমার স্থান যদি সত্যিই নির্দ্ধারিত হ'যে থাকে তবে সে আমার মতো ভাগ্যবানের জন্য; রুক্‌মিণী তোমাকে পেয়েছি বটে কিন্তু এখনো ভালো ক'রে দেখিনি। বলিয়া আমি তাহার কাছে সরিয়া গেলাম।

সে আমাকে সরাইয়া দিল অতি যত্নে, অতি স্নেহে,—যেন আমি তার পরম আত্মীয়, যেন তার প্রাণ-প্রিয়। তারপর আমার ললাটে হাত রাখিয়া কহিল, এখনই পাগলামি ক'রো না। আগে বলো, আজ থাকবে তো?

আজ কেবল?—আমি বলিলাম, আজ, কাল, পরশু, মানে আর যাবোই না তোমার এখান থেকে।

তোমার বাড়ীতে কেউ নেই?

না, কেউ নেই। যদি বা থাকে তারা সবাই একদিকে, তুমি অন্য দিকে। একদিকে পৃথিবীর মানুষের দল, অন্য দিকে চন্দ্রকিরণ। রুক্‌মিণী, আলোটা বাড়াও। চোখে বুঝি তুমি কাজল পরেছ?

একটু পরেছি, এর নাম সুর্মা।

আলোটা বাড়াও।

রুক্‌মিণী উঠিয়া ঘরের বড় আলোটা বাড়াইয়া দিল। তারপর বলিল, কী দেখতে চাও?

আমিও উঠিলাম। আলোয় ঘর হাসিতেছে, তাহার সঙ্গে হাসিতেছিল রুক্মিণী,—আমার দেবী, আমার দীর্ঘ চার বৎসরের স্বপ্ন-কন্যা। তাহার রূপে ডুবিয়া গেলাম। দেখিলাম চোখে কাজল, কিন্তু তাহারই চারিপাশে কেমন যেন বিগত যৌবনের কুঞ্চন-রেখা। সে-চোখে আলো নাই, ঔজ্জ্বল্য নাই—তাহার সহিত যেন গভীর দুষ্কৃতি ও দেহ-বিলাষের অবসাদ জড়াইয়া আছে। কেমন একটা মলিন ছায়া, যাহার দাগ কেবল পুরাতন গণিকাদের দেহেই মাখানো থাকে। আমার মন অবশ হইয়া আসিল।

বলিলাম, মুখে কী মেখেছ?

আমার কম্পিত কণ্ঠস্বরে সে যেন একটু চমকাইল। বলিল রং।

রং? সেই রূপ কোথায় তোমার? যে রূপ আমি সেই প্রথম দিন দেখেছিলাম? কই দেখি!—এই বলিয়া আমি একটা প্রস্তাব করিলাম।

রুক্মিণী আমার চেহারা দেখিয়া কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত ভয় ও ভাবনার সহিত আমার আদেশ পালন করিতে লাগিল। এক সময় হঠাৎ থামিয়া বলিল, আমি পারব না।

পারতেই হ'বে। বলিয়া আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

সে বাধা দিল, আমি বাধা মানিলাম না। আমার চোখের নেশা, মনের নেশা ছুটিয়া গেল। এ আমি কোথায় আসিয়াছি? এ কি সেই রুক্মিণী? অলোর শিখাটা যেন আমাকে রক্তাক্ত জিহ্বা দেখাইয়া বিদ্রূপ করিতেছিল। তাহার স্বাস্থ্য নাই, শ্রী নাই, তাহার রূপ নাই!

অসহ্য ঘৃণায় আমার চোখ ভরিয়া গিয়াছে। তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলাম, একি হ'য়েছে তোমার? কোথায় সেই যৌবন, কোথায় সেই দেবতার সিংহাসন, রুক্মিণী?

আমার গলা ধরিয়া গেল। বীভৎস মাংসস্তূপ, বিবর্ণ, বিশীর্ণ বক্ষ, কদাকার মেদময় স্থূলতা,—আমার সর্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

রুক্মিণী নামের কঙ্কালটি কেবল দাঁড়াইয়া ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। যাহার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, সেই রুক্মিণী এই

মেয়েটি নয়। সম্ভবতঃ পতিতাকে আমি খুঁজি নাই, খুঁজিয়াছি সেই লাবণ্য-লতাকে। পতিতার ভিতরে আশা করিয়াছিলাম আমার পুরাতন মানসী প্রতিমাকে, অকলঙ্ক যৌবনকে। আমার কল্পনার প্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িল।

সে কহিল, তুমি বুঝি থাকতে চাও না?

আমার চোখে জল আসিয়াছিল। বলিলাম, না, আমি চলে যাচ্ছি।

আবার ক'বে আসবে? কাল?

কোনদিন আর আসবো না।

উষ্ণকণ্ঠে সে কহিল, বেশ, তবে টাকা দিয়ে দাও। চার টাকা।

তাহাকে টাকা গণিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। আর কোনদিন পতিতালয়ে আসিব না, আজিকার এই করুন ব্যর্থতাময় দিনটি আমার মনে থাকিবে, সহজে ভুলিব না। রাজপথ দিয়া অন্ধকারে চলিতে চলিতে ভাবিলাম, তবে কি রূপের তৃষ্ণা জীবনকে কেবল কুরূপ করিয়াই তোলে? তবে কি রুক্মিণী বাঁচিয়া নাই, এ তাহার প্রেতিণী? তবে কি হারাইবার জন্যই আজ তাহাকে এতকাল পরে খুঁজিয়া পাইলাম?

আমার বুকের ভিতরে যেন অশ্রু জমিয়া উঠিতে লাগিল,—সে অশ্রু ব্যর্থতার নয়, কেমন যেন সকলের প্রতি অসীম সমবেদনার।

নতুন খাতা।

দিদি, ও দিদি দরজাটা খুলে দেনা ভাই—

মাঘমাসের শেষ, রাত্রি তিনটা। পাতার ঘরখানার ভিতর স্যাঁৎসেঁতে মাটির উপর ছেঁড়া কাঁথার বিছানা পাতিয়া কেরোসিনের সম্মুখে শশী চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বদ্ধ ঘরের ভিতর ডিবের সিস্ উঠিয়া যে পরিমাণে ধোঁয়ায় অন্ধকার করিয়াছিল, ঠিক তত পরিমাণেই ভিজা মাটির কন্‌কনে ঠাণ্ডায় তাহার হাত পা গুলা অবশ হইয়া আসিয়াছিল।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দরজাটা খুলিয়া দিয়া ঝঙ্কার করিয়া সে বলিল, এত রাত অবধি কোথা ছিলি হতভাগা? ভেবে কাঠ হয়ে যাচ্ছি একটু দয়া নেই তোর?—সেই সন্ধ্যে থেকে একলা বসে আছি— বলিতে বলিতে এই ছাব্বিশ বছরের যুবতীটি রাগে অশ্রু গোপন করিতে গিয়া মুখ ফিরাইল।

শিবুর তাহা লক্ষ্য করিবার অবস্থা ছিল না, বলিল, শীতে মরে যাচ্ছি, তুই এখন গাল দিতে বস্‌লি,—বলি খাবার কিছু রেখেছিস্, না সব পেটে পূরে বসে আছিস্?

শশী এত রাগেও হাসিয়া ফেলিল। পরে একখানা কাপড় আনিয়া ঝুপ করিয়া শিবুর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, সেই কোন্ সকালকার কড়কড়া ভাত খেতে পারবি? অসুখ করবে না?—তার চেয়ে আমি বলি আজকের রাতটা—

'উপোসও দেবো না—কড়কড়া ভাত খেয়ে অসুখও করবে না, তুই এখন দিবি কিনা বল্‌—অগত্যা শশী ভাত বাড়িয়া দিল। ঠাণ্ডা কলাইয়ের ডাল মাখিয়া তাহাই সশব্দে খাইতে খাইতে শিবু বলিল, চটকলের বাঁশি বাজছে, রাত শেষ হয়ে গেল বোধ হয়—আজ একটা মজা হয়েছিল দিদি—

এই 'মজায়'—শশীর অনেক অভিজ্ঞতা ছিল, সে সভয়ে চাহিতেই শিবু বলিল, মড়াটাকে শ্মশানে ফেলে যখন—

আবার মড়া ফেলতে গিয়েছিলি বুঝি? তোর জ্বালায় আমার মাথা

খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে, কার কি রোগ আছে তুই ঘরে না নিয়ে এসে ছাড়বিনে? তুই কি আজকাল সরকারী চাকর হয়ে উঠেছিস, যে যখনই ডাকছে তুই গিয়ে তাদের মড়া পুড়িয়ে আসবি? এদিকে ত সারাদিন চুলের টিকি দেখবার যো'টি নেই,—কার রোগ হল, কে খেতে না পেল, কে কাঁদছে—এই সব ত করে বেড়াবি—এ রকম করলেই কি দিন যাবে হতভাগা? শশী সত্যই রাগিয়াছিল।

শিবু এসব কিছুই শুনিল না,—মজার কথা বলিবার জন্য সে তখন ব্যাকুল, বলিল, তারপর শোন্, যাই কাঠ আনতে গেছি, এমন সময় সঙ্গে যারা ছিল চেঁচিয়ে উঠেছে, ওই রে দানো পেয়ে মড়া উঠে বস্‌ল, আমি দৌড়ে আসতেই পচা বাগ্দি বললে, যেওনা শিবু ঠাকুর, তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে,—বলেই বেটারা সব পালিয়ে এল। বেটারা ভেবেছিল শিবে ভয় খেয়েছিল, শিবে সে পাত্তর নয়, তাকে মন্তরও পড়াতে হল না, মড়া আবার শুয়ে পড়ল—ওকি তুই বুঝি শুনছিস না দিদি?

শশী আলোর দিকে চাহিয়াছিল, মুখ ফিরাইয়া বলিল, হ্যাঁ শুনছি, কিন্তু আমি মনে করেছিলাম, তুই হতভাগা কোথাও বুঝি মারধোর করতে গিয়েছিলি, কার বা মাথা ফাটিয়ে এলি, সে গুণটিও তোর খুব আছে জানি ত—

শিবু খাওয়া শেষ করিয়া হাত ধুইয়া বলিল, বাপ্ রে যে শীত এ সময় মারধোর করলে বড় লাগে, তবু হরে তাঁতি বেটাকে সেদিন কসে ঘা কতক কঞ্চি বসিয়ে দিয়েছিলুম—

শশী সভয়ে বলিল, সে কি—কেন?

কেন, বেটা বৌকে সেদিন বিনি দোষে মারতে গিয়েছিল, বলে, তোকে ত্যাগ করব—বেটা জানে না, শিবু ঠাকুর গ্রামে থাকতে কখনও মেয়ে মানুষের অপমান সহ্য করবে না; তা সে নায়েবই হ'ক, আর জমিদারই হ'ক, উঃ কি শীত ধরেছে—বাপরে বাপ্—বলিয়া সে আর কোনও কথা না বলিয়া আপাদ-মস্তক দুই তিনখানা কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

কখনও চরকা কাটিয়া সেই সুতা হাটে বেচিয়া আসিয়া, কখনও কাহারও বাড়ীতে খাটিয়া খুটিয়া, কখনও বা ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গিয়া দিয়া মজুরী পাইয়া ইহাদের দিন চলিত। চলিত, কিন্তু অতি কষ্টে, মাসের মধ্যে যে কয়দিন উপোস যাইত না—তাহা কেবল শশীর সুগৃহিণী-পনায়। অনেক দিন আগে ইহাদের বিধবা মা মরিবার পর এই দুটি ভাই বোন সংসারের সমস্ত ঝড ঝাপটার মধ্যে পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া এতগুলি দিন কাটাইয়া আসিয়াছে। তাই শশী কোনও দিনই তাহার একান্ত অসহায় ভাইটিকে চোখের আড়াল করিয়া কোথাও যাইতে পারে নাই।

পরদিন অত বেলায় রান্না শেষ করিলেও শিবুর দেখা নাই। শশী খানিকক্ষণ উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া থাকিবার পর ঘর দোর ন্যাতা দিয়া নিকাইয়া, বাসন কয়খানা মাজিয়া ধুইয়া উনুনে গোবর মাটি দিয়া লেপিয়া, দাওয়ার উপর একখানা ছেঁড়া চেটাই পাতিয়া জীর্ণ 'সীতার বনবাস' খানি লইয়া বসিল। কিন্তু মাত্র দুই চারি ছত্র পড়িবার পরই শিবু বগল দাবায় একটা কাগজের মোড়া লইয়া আগড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

মুখ তুলিতেই শিবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আবার ওই হতচ্ছাড়া বই পড়ে চোখের জল ফেল্‌ছিস দিদি, তোর জ্বালায় আমি ঠিক কোথায় চলে যাব— বলিয়া মোড়াটা রাখিয়া সে কাপড়ের খুঁট দিয়া শশীর চোখ দুইটা মুছাইয়া দিয়া বলিল, কি এনেছি ছাখ্—

শশী মোড়া খুলিয়া দেখিল, একখানি কোরা শাড়ী, সবিস্ময়ে বলিল, কোথা থেকে আন্‌লি, কে দিলে রে? তোর কই?

আমার নেই, আমার কাপড় ত তুই সেদিনকে সেলাই করে দিলি, তোরই ত মোটে কাপড় ছিল না,—তাঁতিদের গাছ কেটে দিলুম, তারা মজুরী দিতে চাইলে, আমি নিলুম না, বললুম, দিদিকে কাপড় দিস্—

শশী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, মজুরী নিলিনে, সংসার চলবে কি করে?

হ্যাঁ সংসার! নতুন খাতা অবধি সবুর করনা, তোর ঘরের চাল তুলে দেবো, হাতের শাঁখা গড়িয়ে দেবো।

আর আমি সন্নিসি হয়ে যাব—বল্-বল্—মুখপোড়া কোথাকার!

আহারে বসিয়া শিবু দুই চারি গ্রাস মুখে তুলিতে শশী বলিল, গাঁয়ে তোর নিন্দের জ্বালায় ত কাণ পাতবার যো নেই, এই কতলোক কত কথা বলে গেল—

শিবু মুখ তুলিয়া বলিল, নিন্দে! মিথ্যে কথা, এ গাঁয়ে আমায় নিন্দে করবার কেউ নেই—সবাই আমায় দেবতা ভাবে যে দিদি! বলিয়া তেমনি করিয়া সে খাইতে লাগিল।

শশী মৃদু হাসিল। গর্ব্বে তাহার বুকটি ভরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে কাঁপিয়া উঠিল। আজ কোনরকমে সে তাহার এই দেবতা ভাইটির মুখে দু'টী ভাত দিতে পারিয়াছে। ঘরে ত আর কিছু নাই; কাল কি হইবে? আজ সারাদিনই সে এই কথাই ভাবিয়াছে এবং একটি উপায়ও সে স্থির করিয়া রাখিয়াছে। এইবার সেই কথাটাই সে পাড়িল, রতনগাঁয়ে যাবি আজ?

কাদের বাড়ী?

বাবুদের বাড়ী রে!

বাবুদের বাড়ী! কেন, কি দরকার?

তারা যে আপনার লোক; এই বলিয়া শিবুর বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া শশী পুনরায় বলিল, তোরি ভগ্নিপোত হয়।

কি বললি?

যা বলছি তাই—

শিবুর আহারের রুচি চলিয়া গেল। সহসা তাহার দিদির রহস্যময় সিন্দুর রেখা ও হাতের নোয়ার অর্থ বুঝিতে পারিয়া অনেকগুলা আকস্মিক প্রশ্ন তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলিল, তবে তোকে নিয়ে যায় না কেন, আবার বিয়ে করেছে কেন—কেন আবার—? বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দুইটা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

শশী বলিল, বড় লোকের কি একটা বিয়েতে হয় রে—তা ছাড়া আমি গেলে তুই কার কাছে থাকতিস্?

শিবু শান্ত হইয়া বলিল, তবে আবার যাবি কেন—আমি এখনই বা কার কাছে থাকব?

একেবারে কি যাব, তা নয়, ওদের এ মহলের আদায় ওয়াশীলের কাজটা যদি তোকে দেয়, তাই একবার বলতে—

যদি না দেয়, অপমান হ'বি ত?

অপমান কি রে—তোর আপনার লোক, আমারও আপনার লোক; কাজ যদি নাও দেয়, এত দিন বাদে যাচ্ছি, একটুও কিছু সুবিধে হবে না? নিশ্চয় হবে!

শিবু চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে বলিল, নতুন শাড়ীখানি পরে যাস, বেশ হবে—

যাহা হউক, খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া বেলা একটু গড়াইয়া আসিলে, দোরে চাবি দিয়া আগড় বন্ধ করিয়া তাহারা দুইজনে রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

শিবুকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া শশী সন্ধ্যার অন্ধকারে কম্পিত পদে অন্দর মহলে প্রবেশ করিতেই একেবারে জমিদার মদন চৌধুরীর সম্মুখে পড়িয়া গেল। এত সত্বর এবং এত সহজে যে তাহার দেখা পাইবে ইহা সে ভাবে নাই। তাই হঠাৎ কিছু বলিতে পারিল না; কিন্তু মদন চৌধুরী পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সে সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, আমি এলুম।

মদন মুখ ফিরাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, কেন?

শশীর কথা আটকাইয়া গেল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া মুখ ফুটিয়া সে বলিল, আসবার অধিকার আছে তাই এসেছি।

মদন বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া উঠিল, অধিকার! মিথ্যে বিয়ের এত জোর, সত্যি বিয়ে হ'লে না জানি কি করতে!

অপমানে শশীর অধরোষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, কোন মতে কান্না চাপিয়া সে বলিল, লোকে বলেছিল, আমি তা বিশ্বাস করিনি! পুরুতের সামনে মন্ত্র পড়ে যে তুমি আমায় গ্রহণ করেছ।

মদন হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তার চোদ্দপুরুষেও পুরুত নয়! সে আমাদের গ্রামের মধ্যে নাপতে, তোর ন্যাকামির জন্যে তাকে পুরুত সাজিয়ে নিয়ে গেছিলাম! এখন বিশ্বাস হ'ল ত! এইবার সরে পড়।

শশীর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কোন রকমে দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, তুমি এত বড় জোচ্চোর! শশীর ভিতরটা পুড়িয়া যাইতেছিল।

মদন চৌধুরী ভূমিতে পদাঘাত করিয়া বলিল, কি বলছিস্ হতভাগী, যত বড় মুখ নয়—

হ্যাঁ তত বড়ই কথা,—তখন যদি কোন রকমে বুঝতে পারতুম। কিন্তু যদি আমি সতী হই, ভগবান এর বিচার করবেন। এই বলিয়া শশী কাঁদিতে লাগিল।

কি! আমার বাড়ী ঢুকে ভগবান দেখিয়ে আমায় অপমান করা! মদনের আর সহ্য হইল না। পায়ের নিকট একখানা পোড়া কাঠ পড়িয়াছিল, তাহাই তুলিয়া লইয়া সজোরে শশীর পিঠে দুই চারি ঘা বসাইয়া দিল।

মাতা, ভগিনী, পিসী, পত্নী সকলে ছুটিয়া আসিল। মদন দেখিল বেগতিক; পাছে আপনার কাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ছুঁড়ি এসেছে মেজাজ দেখাতে, আমি বল্‌ছি দু'সনের সাড়ে তিন টাকা খাজনা বাকী, ওটা দুবারে দিয়ে দিস্—বলে কিনা, তুমি জোচ্চুরী করে আমার কাছে বেশী নিচ্ছ, এত বড় কথা,—তবু দাড়িয়ে রইলি? বেরো হারামজাদী, বেরো। বলিয়া তাহাকে ধাক্কা মারিয়া সরাইয়া দিয়া নিজেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

ছোড়দি বলিলেন, হতভাগি কার সঙ্গে কথা বলছে জানে না—

মা বলিলেন, তা বাছা ভাল করে বললেই হ'ত—বদ্‌রাগী মানুষ, যা মা কিছু মনে করিস্‌নে, আচ্ছা আমি তোর খাজনা মাপ করলুম—

শশী চলিয়া যাইতেছিল, পিসিমা পিছন হইতে বলিলেন, চলে যাস্‌নে বাছা, চারটি খাবার নিয়ে যা, ঘরে গে খাস্‌—ওঃ ছুঁড়ির দেমাক দেখ, কথা শুনলে না—

সকলের অলক্ষ্যে বস্ত্র সংযত করিয়া যথাসাধ্য কান্না চাপিয়া,—চোখ মুছিয়া, মুখখানাকে সহজ করিয়া শশী বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। শিবু কিছুই জানিতে পারে নাই, সে অদূরে দাঁড়াইয়া একটা চারা গাছ কিরূপ কৌশলে ও যত্নে রোপণ করা হইয়াছে তাহাই নিবিষ্ট মনে দেখিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া বলিল, এই সিউলি গাছটা নিয়ে যাব দিদি?

না কিছু নিতে হবে না এখন চল—

নিলেই বা, তুই এ বাড়ীর বউ, তোরও ত এ সবে দখল আছে, তা ছাড়া তুই ত রোজ বিনি ফুলে পূজো—ও কি কাঁদছিস বুঝি?

শশী মুখ ফিরাইয়া বলিল, তুই আমায় কেবল কাঁদতেই দেখিস্‌ মুখপোড়া, নে দাঁড়িয়ে থাকিস্‌নে চল্‌—আমার আর ভাল লাগছে না—এই বলিয়া শশী হন্‌হন্‌ করিয়া আগে আগে চলিল।

এক হাঁটু ধূলা ভাঙ্গিয়া মাঠের উপর দিয়া চলিতে চলিতে শিবু বলিল, তুই ও বাড়ীর বৌ, তোকে কেমন আদর যত্ন করলে দিদি?

কান্না চাপিয়া শশী বলিল, তাড়াতাড়ি আয় ভাই, সন্ধ্যে হয়ে এল।

চল্‌ ওই আমাদের গ্রাম দেখা যাচ্ছে।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই শশী একেবারে অবসন্নের মত মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

শিবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, অমন করে বসে পড়লি যে দিদি?

শশী বলিল, মাথাটা ঘুরছে, অনেকখানি রাস্তা হাঁটা হয়েছে কি না!

জল আনব ?

না, তুই বস্ এখানে।

শিবু বসিয়া পড়িয়া বলিল, আজ কিছু খাবিনে দিদি ?

না, ক্ষিদে নেই।

শিবু যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, বলিল, আমারও খেতে ইচ্ছে নেই দিদি, এইখানেই শুয়ে পড়ি।

আচ্ছা শুয়ে পড়। শিবু শুইয়া পড়িলে তাহার পাশেই গায়ের চাদরখানি মুড়ি দিয়া শশীও শুইয়া পড়িল। অন্ধকারে তাহার চোখ দিয়া নিঃশব্দে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অল্প অল্প জ্বরে ভুগিলেও দেড়মাস শশী উঠিয়া বেড়াইল, তাহার পর আর পারিল না, বিছানা লইল। শিবু হতাশ হইয়া বলিল, ওষুধ না খেয়ে মরতে বস্‌লি যে দিদি—

শশী বলিল, এক বেলা ভাত জোটে না, ওষুধ খাওয়াবি কি করে ?

যেমন করে পারি খাওয়াব, চাল না কিনে ওষুধ কিন্‌ব—

তারই বা পয়সা কই—

শিবু মাথায় হাত দিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল। তারপর বলিল, নতুন খাতার যে এখনও আরও পাঁচটা দিন বাকি !

মৃদু হাসিয়া শশী বলিল, তাতে কি, নতুন খাতা এলে তুই কারো ডুবো নৌকা তুলে আন্‌বি ?

শিবু জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, দেখে নিস্—দেখে নিস্—জমির দালালিতে মেজ মিত্তির করকরে একটি শো টাকা আমার পায়ের কাছে ঢেলে দিয়ে যাবে, তখন বলবি, ষোল বছরের শিবুর কি গুণ—

তোকে ?

হাঁ এই শর্ম্মাকে—দেখবি—তুই যে রোগ করে সব মাটি করলি—

শশী অতিকষ্টে উঠিয়া রাঁধিবার যোগাড় করিতে বসিলে, শিবু চিৎকার

করিয়া বলিল, অসুখ শরীরে উঠে রাঁধলে কোন্ শালা না ফেলে দেয় সব—হাঁ—

অগত্যা শশী ফিরিয়া আসিয়া আবার কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। বেলায় জ্বর ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

ডোবার জল প্রায় শুকাইয়া গিয়াছিল, তাহাতেই কোনওরূপে মাথা ডুবাইয়া আসিয়া আগের দিনকার কেনা চারটি চিঁড়ে মুড়কি চিবাইয়া এক ঘটি জল খাইয়া শিবু বাহির হইবার উদ্যোগ করিল। শশী বলিল, এত রোদে কোথায় যাচ্ছিস শিবু—?

শিবু রাগিয়া বলিল, যা তুই আমার সঙ্গে কথা কস্‌নে, তুই নিজের দোষে আখের নষ্ট করলি,—তুই অত বড় জমিদারের বৌ, ওষুধ পথ্যি না পেয়ে মরতে বস্‌লি, বুড়ো মাগি, তোর একটু জ্ঞান নেই! বলিতে বলিতে তাহার গলা বুঁজিয়া আসিল। আর কিছু না বলিয়া ভাঙ্গা টিনের বাক্সটা হইতে অনেকদিন আগে পৈতার সময়কার চেলীখানা বাহির করিয়া গামছায় মুড়িয়া লইয়া বাহিরে আসিল এবং কি একটা কথা বলিতে গিয়া সহসা থামিয়া আগড়টা খটাস করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

শশী একটু হাসিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল, তাহার চোখের জল চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। পাগলা নিতাইয়ের কাছে চেলীখানা এক টাকায় বন্ধক রাখিয়া যখন শিবু বদ্যির নিকট হইতে ঔষধ আনিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। তারপর আলো জ্বালিয়া যখন শশীর নিকট আসিয়া বসিল, দেখিল, জ্বরে সে অজ্ঞান অচৈতন্য, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে আগুন ছুটিতেছে। গাঢ়স্বরে সে বলিল, দিদি ওষুধ খা—

শশী চোখ চাহিয়া বলিল, শিবু? কখন এলি শিবু—ওষুধ কোত্থেকে আন্‌লি?

চেলীখানা বাঁধা দিয়ে আনলুম—

কেন আন্‌লি? এমন করে তোর সব সম্বল কেন খোয়াচ্ছিস্ ভাই?

বেশ করিছি, তুই এখন ওষুধ খা—খাও লক্ষ্মী দিদি আমার—নতুন খাতার

পর দেখবি—তোর আমার কত কাপড় চোপড় কিনে আন্‌ব—তখন এ সব কথা মনেই থাকবে না—

শশী আর কিছু না বলিয়া বড়ি খাইল।

কিন্তু চারদিন পরেও যখন জ্বর ছাড়িল না বরং সে আরও দুর্ব্বল এবং আরো অঘোর হইয়া পড়িল, তখন শিবু অন্ধকার দেখিল। আর কোনও উপায় নাই, সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কাছে আসিয়া সে বলিল, দিদি, ঠাকুরের চন্নামেত্ত খাবি?—তুই ত বলিস্ চন্নামেত্ত খেলে অসুখ ভাল হয়—

ক্ষীণ স্বরে শশী বলিল, তাই দে ভাই—

শিবু ঠাকুরের বেলপাতা ও চরণামৃত আনিয়া দিদিকে খাওয়াইল। তাহাতেও কিছু হইল না।

দুপুর বেলায় গামছা মাথায় দিয়া শিবু বাহির হইয়া পড়িল। খোলা মাঠের উপব চৈত্র মাসের রৌদ্র চন্‌চন্ করিতেছিল। রাশি রাশি ধূলা লইয়া এক একটা উত্তপ্ত বাতাস মাঝে মাঝে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। বৈদ্যের বাড়ী আসিয়া গামছা দিয়া ঘাম মুছিয়া সে বলিল, তোমাকে যেতেই হবে, নইলে অসুখ সারবে না—

বৈদ্য রাগিয়া বলিল, ফের বিরক্ত করতে এসেছিস—বলেছি না তোর বাড়ীতে যেতে পারব না?

শিবু বিস্মিত হইয়া বলিল, কই এ কথা বলনি ত? যাবে না কেন?

তোর বাড়ীতে যেতে মানা আছে—

সে কথা বুঝিতে না পারিয়া শিবু বলিল, তবে কি ছাই ওষুধ দিলে, অসুখ সারে না কেন?—আমার টাকা ফিরিয়ে দাও—

টাকা ফিরিয়ে দাও! একি মগের মুলুক! বেরো আমার বাড়ী থেকে, হারামজাদা—

তাহার চিৎকারে তিন চারিটা লোক ছুটিয়া আসিল।

জলন্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া শিবু বলিল, বেরো হারামজাদা? তোমাব এত বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে! আমার দিদির অসুখ, এখনি যেতে হবে,

নইলে আজ সকলের সামনে তোমার টিকি ধরে ঝুলতুম। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

আর কোন উপায় করিতে না পারিয়া যখন সে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন দুঃখে হতাশে তাহার বুকের ভিতর কান্না জমাট হইয়া উঠিয়াছে। এ গ্রামে তাহার সমস্ত ক্ষমতা প্রতিপত্তি এক মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হইয়া গিয়া সে যেন নিতান্ত শিশুর মত নিরুপায় হইয়া পড়িল এবং দিদির এই অবস্থায় সে যে কোন্ দৈব অভিশাপে একটা কিছু উপায় করিতে পারিতেছে না, তাহার জন্য তাহার নিজের হাতেই কামড়াইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও একটা পাখীর ডাক পর্য্যন্ত শুনা যায় না। কেবল বহুদূর হইতে রেলের বাঁশির একটা অস্পষ্ট সুর কাঁপিয়া কাঁপিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল। অত্যন্ত সন্তর্পণে আলো জ্বালিয়া শিবু অসাড় রোগীটির কাছে আসিয়া খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিল। পরে গায়ে হাত বুলাইয়া ডাকিল, দিদি—

শশী হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল। তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। তারপর শিবুকে কাছে ডাকিয়া আপনার তপ্ত বুকের উপর তাহার মাথাটা রাখিয়া মুখে হাত বুলাইয়া ডাকিল, ভাই!

কি দিদি?

বড় ভুল করেছিলুম যে ভাই—তার কথায়—

কি ভুল দিদি, আমি থাকতে তোর কিসের ব্যথা?—দরদর করিয়া শিবুর চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

তোকে ফেলে যে আজ কোথাও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না ভাই—

দিদি আমি মাকে দেখিনি, আজ তুইও—ওকি তোর কাপড়ে রক্ত কেন রে, দিদি? বলিয়া অনেক দুর্ব্বল আপত্তি সত্ত্বেও শিবু তাহার পিঠের কাপড়টা সরাইয়া আলোয় দেখিল, দগদগে ঘা পচ ধরিয়াছে—দুই চারিটা পোকাও পূঁজ রক্তের সঙ্গে বিড় বিড় করিতেছে! সে শিহরিয়া উঠিয়া খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিল, কি করে হ'ল দিদি?

আজ দেড়মাস এই প্রহারের ঘা শশী লুকাইয়া ছিল, আজ ধরা পড়িয়া গিয়া মনে মনে ভয় পাইয়া বলিল, ঘা ত আপনিই হয় ভাই—

আমায় দেখাস্‌নি কেন ? এতদিন লুকিয়েছিলি কেন ?

শশী কিছু বলিতে পারিল না। শিবু উঠিয়া বাহিরে দাওয়ায় গিয়া বসিল। তাহার হাড় পাঁজরার ভিতর যেন সহস্র ছুঁচ ফুঁটিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে ছুটিয়া গিয়া দিদির পাশে বসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে শিবু বলিয়া উঠিল, কাল নতুন খাতা, এই রাতটা কোন রকমে বেঁচে থাক দিদি ; কাল সহর থেকে বড় ডাক্তার এনে দেখাব, তোকে বাঁচিয়ে তুল্‌বো।

শশী একবার তাহার বড় আদরের ভাইয়ের দিকে চাহিল ; কোন কথা কহিতে পারিল না, তাহার স্বর বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

শিবু দুই হাতে চোখ চাপিয়া সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িল। কখন্ যে সে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিয়া সে ব্যাকুল হইয়া ডাকিল, দিদি, অ দিদি, দিদি !

তিন চারিবার ডাকিয়াও যখন শশীর সাড়া পাইল না, সে অত্যন্ত ভয় পাইয়া আলোটা বাড়াইয়া দিয়া মুখের উপর মুখ লইয়া গিয়া দেখিল, কপালের কাছে চক্ষু দুইটা স্থির হইয়া আছে, গা ঠাণ্ডা—সারা দেহটা একেবারে কাঠ। গা ঠেলিয়া সে আবার ডাকিল, দিদি ! উত্তর নাই। অকস্মাৎ সে মেজের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে একবার উঠিয়া পুনরায় জোরে নাড়া দিল—সংজ্ঞার চিহ্নমাত্র পাইল না। তখন সে তাহার সেই চিরদিনকার আশ্রয় মাতৃসমা দিদির মরণ-শীতল বুকটার উপর মাথা রাখিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া কাঁদিল।

অন্ধকার রাত্রি খাঁ খাঁ করিতেছিল। ভাঙ্গা পাচিলটার উপর একটা প্যাঁচা চিৎকার করিয়া গলা ফাটাইতেছিল। শিবু আস্তে আস্তে উঠিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঘরে শিকলটা টানিয়া দিয়া রাস্তায় পড়িয়া হন্‌হন্ করিয়া

চলিল। কিছু দূর আসিয়া অন্ধকারে আন্দাজে একটা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া ডাকিল, কেলো আছিস্?

হ্যাঁ—

একবার বেরিয়ে আয় ত। কেলো বাহির হইয়া আসিলে বলিল, একবার যেতে পারবি ভাই?

কোথায় রে?

শ্মশানে—দিদি মরে গেছে, যা চট্ করে আয়, আমি দাঁড়াই—

সে ভিতরে গিয়া একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, একটা মাদুলী ধারণ করেছি ভাই, মা শ্মশানে যেতে বারণ—

আচ্ছা থাক তবে বলিয়া শিবু তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। তারপব এ পাড়া সে পাড়া ঘুরিল, কাহাকেও সে পাইল না। একটা চালের গোলার সুমুখে আলো জ্বালিয়া চণ্ডীমুদি বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তাহাকে বলিল, আজ দিদির শেষ হয়ে গেল, কাঁধ দিতে যাবি?

হয়ে গেল, আহা জুড়িয়ে গেল! হতভাগা জমিদার অমন ভালমানুষ—

যাবি কিনা বল—

যেতে পারতুম ভাই—কিন্তু বউটার আবার কেমন রাতে একলা থাকতে বুঝলি ত—হাজার হ'ক ছেলেমানুষ কিনা—

শিবু চলিয়া গেল, তাহার ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল। আর কোথাও না গিয়া সে ফিরিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়ির নিকটবর্ত্তী হইতেই কে বলিল, শিবে কোথা যাস্ এত রাতে?

কে নিলু, আয় ভাই, তোর পায়ে পড়ি একবার আয়, দিদি মরে গেছে! বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

নিলু ইহাদের দলের মধ্যে একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বলিল, কিন্তু আমাদের যাবার ত জো নাই—

কেন ভাই?

কেন—কত কথা উঠেছে তা জানিস্ তোর দিদির নামে?

শিবু এক পা সরিয়া আসিল। চক্ষু দুইটা তাহার বাঘের মত জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, দিদির নামে! কি কথা?

তা বলা যায় না—

বজ্র মুষ্টিতে নিলুর হাত ধরিয়া সে বলিল, বলতেই হবে তোকে, নইলে আজ এইখানে তোকে শেষ করে দেবো—

তবে শোন, সকলে বলছে, গাঁ শুদ্ধ লোক বলছে, তাইতেই ত তোদের সমাজে ঠাঁই নেই, একঘরে করে রেখেছে, বলেছে শিবের দিদিটা অসতী—

অসতী! শিবুর হাতটা নিলুর হাত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। থমকিয়া দাড়াইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে বলিল, অসতী! আমার দিদির মতন সতী যদি কেউ থাকে—তার পা ধোয়া জল খেতে বলিস্, গাঁ শুদ্ধু লোক উদ্ধার হয়ে যাবে; ভালই হয়েছে, আমার দিদি আজ এ নরক ছেড়ে স্বর্গে চলে গেছে—বলিয়া নিজের বিকৃত মুখখানা দুই হাতে চাপা দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

গভীর রাত্রে শবদেহ কাঁধে করিয়া সে নদীর তীরে বালুচরের উপর আনিয়া ফেলিল। তারপর রাস্তার উপর হইতে গাছের শুকনো পাতা ডাল খড় ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রাশীকৃত করিল। পরে শবদেহটাকে সযত্নে তাহার উপর তুলিয়া দিয়া আগুন দিল। আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেই সে গিয়া জলের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

চিতা যখন নিবিল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঠাণ্ডা বাতাস বইতে সুরু করিয়াছে। শিবু চমকিয়া উঠিল। আজ নতুন খাতা! এমন সময় নদীর প্রথম জুয়ারের একটা ঢেউ আসিয়া ছাইগুলোকে ভাসাইয়া লইয়া গেল—শিবু তাহা লক্ষ্য করিয়া চক্ষু মুছিয়া স্খলিত পদে নদীর ধার দিয়া বরাবর উত্তর দিকে চলিয়া গেল।

সেইদিন হইতে আর কেহ তাহাকে সে গ্রামে দেখে নাই।

সমাপ্ত